তবু মনে রেখো

রচনা-পুরাকাহিনী

না, গল্প বা উপন্যাস এটা নয়। আদৌ কোন গল্প হ'ল কিনা তাও জানি না। হ'লে—সে গল্প বিধাতারই রচনা, আমার নয়।

আমি বলছি অনেকদিন—ধরুন আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগের কথা।

আমরা তখন কাশীতেই থাকি। বছর আষ্টেক-নয় বয়স আমার। হঠাৎ মা খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেন, রান্না করা কি আগুন-তাতে যাওয়াই নিষেধ হয়ে গেল।

আমাদের কোন অসুবিধা হ'ল না বিশেষ। নামকরা হোটেল 'পার্বতী আশ্রম'-এ মাথাপিছু মাসিক ছ'টাকা হিসেবে দুবেলা খাওয়ার ব্যবস্থা হল। পার্বতী ঠাকুর হোটেল চালাতেন, নিজেই রান্না করতেন অনেক সময়। দশাশ্বমেধ রোডের ওপর হোটেল। সেখানে এখন অন্য হোটেল হয়েছে।

সে যাই হোক বিপদ বাধল মাকে নিয়ে, বিধবা মানুষ—কার কাছে খাবেন?

রাঁধুনী রেখে রান্না করানো হবে, সে সঙ্গতি তখন ছিল না।

বেশ কয়েক দিন আধা-উপোসে কাটাবার পর একটা সুরাহা হ'ল।

আমাদের পাশের বাড়ির নিচের একটা ঘরে ভাড়া থাকতেন গোসাঁইগিন্নী, ও-পাড়ার বৃদ্ধাদের তিনিই ছিলেন বলতে গেলে অভিভাবিকা, কারণ তাঁদের দুই ননদ-ভাজের পুরো বারোটি টাকা মাসোহারা আসত। তখন তিন টাকাতে বহু বিধবা কাশীতে মাস চালাতেন। তাঁদের মধ্যে গোসাঁইগিন্নী ধনী বলে গণ্য হবেন, এ তো স্বাভাবিক।

তিনিই খবরটা দিলেন।

পাঁড়ে-হাউলীতে এক ব্রাহ্মণ বাড়ি খাওয়ার ব্যবস্থা হতে পারে,

বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত শিব আছেন, নারায়ণ আছেন—নিত্য ভোগ হয়—সেই প্রসাদই পাওয়া যাবে। তবে তাদের খাঁইটা একটু বেশী, একবেলা খাওয়ার জন্যেই মাসে চার টাকা চায়।

যেখানে ছ'টাকায় দুবেলা মাছ-মাংস নানা-ব্যঞ্জন খাওয়া হয়—সেখানে একবেলা নিরামিষ খাওয়ার জন্যে চার টাকা অবশ্যই বেশী। কিন্তু তখন আর উপায়ও ছিল না। মা অগত্যা রাজী হয়ে গেলেন।

গোসাঁইগিন্নী বললেন, 'তিন টাকা হলেই ঠিক হ'ত, তবে কি জানো মা, টাকাটা অপাত্রে পড়বে না। বড্ড অভাব ওদের, এর ওপরেই ভরসা—সংসার চালানো, ঠাকুরসেবা সব।…ঠাকুরসেবার কড়ারেই বাড়িটা পেয়েছিল মটরার বাবা, তা সেবা তো কত—করবে কোত্থেকে, জীবনে তো কোনদিন কিছু করল না। গাঁজা খেয়ে আর সিদ্ধি খেয়েই কাটিয়ে দিলে। ছেলেগুলোও হয়েছে তেমনি, বাপের ধারা আঠারো আনা পেয়েছে। নেশায় পঞ্চরঙ—কোনটা বাকী নেই। বড়টার আবার বে' দিয়েছে সাত-তাড়াতাড়ি—পোড়ার দশা, ওর চেয়ে মেয়েটাকে হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দেওয়াও ভালো ছিল…মাঝখান থেকে মাগীটারই কষ্ট এমনি আরও দু-তিন জনকে ভাত যোগায়—তাইতে কোনমতে কটা পেট চলে। তাই কি সবদিন জোটে, নেশার পয়সা না জুটলে গুণধররা এসে মাকে ঢিবঢিবিয়ে দিয়ে—যা থাকে দু-এক পয়সা কেড়ে নিয়ে চলে যায়-গাঁজা-চরস খেতে।'

এর পর সে বাড়িতে খেতে যাওয়া কেন—পা দিতেও ইচ্ছে করে না কিন্তু আমরাও তখন নিরুপায়। না হলে মাকে উপোস করে থাকতে হবে। অসুবিধে ঢের—জায়গাটাও আমরা যেখানে থাকতুম লক্ষ্মীকুণ্ড থেকে বহুদূর, এক মাইলেরও বেশী। এখনকার মতো তখন সাইকেল-রিক্সা ছিল না—আর দেড়-দু মাইল পথের জন্য এক্কা করার কথা কেউ ভাবতেও পারত না। সুতরাং হেঁটেই যেতে হবে।

তবু তাতেই রাজী হলেন মা।

আর, একা যাওয়া তো তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়—ঠিক হল আমিই সঙ্গে যাব। তখনও আমি ইস্কুলে ভর্তি হইনি। বাড়িতেই পড়ি। নিজে হোটেল থেকে খেয়ে এসে আবার মাকে নিয়ে ওখানে যাব—এই রকম ব্যবস্থা রইল।

আজ আর আমার বাড়িটা ভালো মনে নেই। শুধু মনে আছে, পাঁড়ে-হাউলীর সংকীর্ণ গলিটা যেখানে সঙ্কীর্ণতর হয়েছে সেইখানে কোথাও ছিল।

হয়ত আজও আছে—কে জানে। বাড়িতে ঢুকতেই চলনের বাঁহাতি ঠাকুরঘর, সেখানে প্রকাণ্ড একটা শিবলিঙ্গ আর তার পাশে একটা কাঠের আধভাঙ্গা সিংহাসনে একটি শালগ্রাম শিলা ও একটি গোপাল মূর্তি।

পরে শুনেছি—রুপোরই সিংহাসন ছিল—মটরার বাবা বেচে খেয়েছে।

বাড়িটা বেশ বড়, একটু উঠোনও আছে। দোতলা বাড়ি, নিচের তলা—যেমন বাঙ্গালীটোলার বাড়ি হ'ত—এখনও আছে—তেমনিই। অন্ধকার, স্যাঁৎসেঁতে। গরমের দিনে দুপুরে আরামদায়ক—অন্য সময় বাসের অযোগ্য।

তবু মটরার মা ছেলেমেয়ে নিয়ে সেখানেই থাকেন। ওপরের তিনটি ঘরের একটায় মটরার দাদা থাকে বৌকে নিয়ে—আর একটা ঘরে ভাড়া থাকেন এক ভদ্রমহিলা। দুবেলা খাওয়া ও ঘরভাড়া ধরে মোট আট টাকা দেন। আর একটা ঘরে ভাড়াটে আছেন, তিনিও বিধবা—তবে তিনি নিজে রেঁধে খান ওপরের চিলেকোঠায়, শুনেছি—তিন টাকা ভাড়া দেন। কিন্তু আলাদা খেলেও বহু খেজমতই মটরার মাকে খাটতে হয় তাঁর, উনুন ধরিয়ে, না ধরলে বাতাস করে—সেই উনুন ছাদে পৌছে দিয়ে আসতে হয়।

এই ক'টি টাকাই মোট আয়।

অবশ্য হ্যাঁ—আরও একটা ছিল, পাশে কে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক থাকতেন, খুব বৃদ্ধ, তাঁরও খাওয়ার ব্যবস্থা এইখানেই। তিনিও একবেলা খেতেন—তবে তাঁর ভাত পৌঁছে দিয়ে আসতে হ'ত রোজ। তিনিও মাসে চার টাকা দিতেন, পরে যা শুনেছিলুম।

এ বাড়িতেও লোক কম নয়। তিন ভাই, দুই বোন, একটা বৌ এবং মটরার মা।

এই ক'টা টাকাতেই সকলের খরচ চালাতে হ'ত।

কদাচিৎ কোন পূজো-আশ্রার দিনে দু-এক পয়সার পূজো পড়ত—কী এক-আধখানা কাপড়। বাড়তি আয় বলতে ঐটুকু। সে কিছুই নয়—কাজেই খাওয়ার আয়োজন ছিল খুব সংক্ষিপ্ত। ডাল, আলুভাতে আর একটা যাহোক তরকারী এবং একটা টক্।

যখন যে আনাজ সস্তা—সেই আনাজই বেশী ব্যবহার করতেন মটরার মা, তাও বাইরের যারা অতিথি, এখন যাদের 'পেয়িং গেস্ট' বলা হয়—তাদেরই পাতে সেটা পড়ত। নিজেদের ঐ ডাল আর আলুভাতে যা করে।

রাতের জন্যেও নাকি সেই ডালই ঢালা থাকত, আর রুটি—দুবেলা উনুন জ্বালার খরচা পোষাত না।

ঐ বাড়ি, ঐ খাওয়া—অত দূর—মা যে বেশী দিন টিঁকে থাকতে পারবেন—তা মনে হয়নি।

কিন্তু উপচারের দৈন্য মটরার মা-র অন্তরের ঐশ্বর্যে ঢেকে গিয়েছিল।

অমন নিপাট ভালমানুষ, অমন যেন-সকলের-কাছে-অপরাধী—আমি আর দেখি নি। যত্ন করতেন বললে কিছু বলা হয় না, অতিথিদের যেন পূজো করতেন।

তাঁর সেই আন্তরিকতাতেই মা মায়ায় পড়ে গেলেন। দৈনিক প্রায়

তিন মাইল হেঁটে যাওয়া-আসার কষ্টও আর তেমন অসহ্য মনে হ'ল না।

অসহ্য আমারও বোধ হয় নি। কথা ছিল আমি প্রথম প্রথম কয়েক-দিন সঙ্গে গিয়ে মা-কে একটু 'সড়গড়' করে দেব, কিন্তু সে সময় পার হয়ে যাওয়ার পরও আমি যেতেই লাগলুম।

এমনিতেই কাশীর ঐ ভ্যাপ্‌সা গন্ধওলা বাড়ি আর রৌদ্রবিরল গলি আমার ভাল লাগত।

আমরা বাঙালীটোলার বাইরে থাকতুম বলেই বোধহয় ভাল লাগত।

বিশেষ এই গলিগুলো—অন্ধকার জনবিরল অথচ পরিচ্ছন্ন। পরিচ্ছন্ন শব্দটা ইচ্ছে ক'রেই বললুম, কারণ সত্যিই তখন গলিগুলো এখনকার মতো অত নোংরা ছিল না। এখন যেমন চলাই যায় না—ঐটুকু পথ তাও আজকাল জঞ্জালে আবর্জনায় ভরে থাকে—তখন তা ছিল না।

কাশী বলতে যে ছবিটা আমাদের চোখে ভেসে ওঠে, যে কাশীকে সুনীতি চাটুজ্যে মশাই ভেনিসের সঙ্গে তুলনা করেছেন—সে কাশী আর নেই।

এখন যাদের জ্ঞান হচ্ছে তারা সে কাশীর কথা গল্প-উপন্যাসে পড়বে —কিন্তু ধারণা করতে পারবে না।

কাশীর এখন দ্রুত উন্নতি হচ্ছে, বড় বড় চওড়া চওড়া রাস্তা, নতুন নতুন বসতি গড়ে উঠছে, ধীরে ধীরে অন্য যে কোন বড় শহরেরই রূপ নিচ্ছে।

আমাদের পূর্বপুরুষদের তো বটেই, আমাদেরও—কাশী এই নামটি উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই—মনে আসে সত্য-কল্পনা-কিম্বদন্তীতে গড়া একটি আধ্যাত্মিক রূপ।

আর কোন তীর্থের নামেই এমনটা হয় না। কাশী সিদ্ধ-সাধক-শূন্য হবে না কোনদিন, একথা জ্ঞান হয়ে পর্যন্ত শুনেছি।

চোখে দেখেছি বাঙালীটোলার গলিতে গলিতে—গণেশ মহল্লায়,

অগস্ত্যকুণ্ডুতে, মান সরোবরে, ত্রিপুরাভৈরবীতে—অন্ধকার জরাজীর্ণ সব বাড়ি, তার মধ্যে এক এক দিকপাল মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত।

ভাঙ্গা পুরনো মঠ-বাড়িতে বড় বড় নামকরা সন্ন্যাসী ; ছত্রে ছত্রে কত বিদ্যার্থী নিরাশ্রয় ব্রাহ্মণের আহারের ব্যবস্থা ; মন্দিরে মন্দিরে সানাই-নহবৎ-শাঁখ-ঘণ্টা-ঘড়ির অপূর্ব ঐকতান ; সামান্য মাসিক তিন টাকা কি পাঁচ টাকা আয়ে নিরাশ্রয় বিধবাদের আত্মসম্মান বজায় রেখে বেঁচে থাকার ব্যবস্থা ; দেখেছি রাত চারটে থেকে গঙ্গাস্নান-দর্শনের ভীড়, তিন-চারটি ক'রে তণ্ডুলের কণা ভিক্ষা পেতে পেতে ভিখারীর সামনে প্রয়োজনের ঢের বেশী খাদ্য জমে উঠতে ; শুনেছি একা-ওলা, টাঙ্গা-ওলার মুখেও অপরিচিত পথিকদের প্রতি প্রীতি-স্নিগ্ধ সম্ভাষণ—'এ গুরু', 'এ রাজা', 'এ দাদা'—প্রভৃতি।

তেহি নো দিবসাঃ গতাঃ।

তবু, কাশীর চিহ্ন অদ্যাপি কিছু আছে ঐ গলিগুলোতেই।

তবে বেশী দিন আর থাকবে না। কেদার পর্যন্ত তো রিক্সা যাচ্ছেই, শোনা যাচ্ছে বিশ্বনাথের গলি ভেঙ্গে চওড়া রাস্তা বার করা হবে, বিদেশী টুরিস্ট্‌দের গাড়ি যাবার সুবিধে করতে।

উত্তর-প্রদেশের সাত্ত্বিক সরকারের জয় হোক!

আকর্ষণ আরও কিছু ছিল অবশ্য। সেটা মানবিক।

মটরার মার তিনটি ছেলেই অবতার বিশেষ। ছোটটার বয়স তখন বোধহয় বছর ষোল-সতেরো—দেখতে খুবই ভাল ছিল—কিন্তু সে আবার এক মাত্রা ওপরে। তার তখনই আর সিদ্ধি বা গাঁজা-চরসে সানাত না। বোতলও চলত মধ্যে মধ্যে। কে তাকে যোগাত এ সব খরচ তা কেউ জানত না। জনশ্রুতি—মদনপুরায় এক মুসলমান দোকানদারের সঙ্গে খুব ভাব ছিল, তার কাছ থেকেই কিছু কিছু পেত। তবে তার এক

পয়সাও মা পেতেন না—তা বলাই বাহুল্য।

ছেলে তিনটিই বড়, তারপর ছুটি মেয়ে—খেন্তি ও মেন্তি।

মেয়ে ছুটি মার মতো স্বভাব পেয়েছিল, অমনি ঠাণ্ডা, অমনি সদা-বিনত ও বাধ্য।

মা বলতেন—'নেটিপেটি'।

ভূতের মতো খাটত মেয়ে ছুটো মায়ের সঙ্গে—মার সঙ্গেই দাদাদের চড়টা-চাপড়টাও ভাগ্যে জুটত।

পেটভরে খেতেও পেত না বোধহয় বেচারীরা, কাপড় বলতে যৎপরোনাস্তি মোটা ও সস্তা দামের মিলের শাড়ি। ছুখানার বেশি তিনখানা ছিল না কারও। বারো আনা চোদ্দ আনায় যা মিলত তখন, তাও দৈবাৎ ছুখানাই ভিজে গেলে গামছা পরে থাকতে হ'ত। তবু এসব কাপড় ওদের নিজস্ব রোজগার। কুমারী-পূজোর পাওনা।

এদের মধ্যে খেন্তিই বড়—বোধহয় বছর দশ-এগারোর হবে, মেন্তি সম্ভবত আমার একবয়িসী।

ফুটফুটে মেয়ে, মটরার মার রঙ ছঃখে অভাবে-অনশনে পুড়ে গিয়েছিল, তবে ছেলেমেয়েরা সবাই ফরসা, মেন্তি তো বিশেষ করে—ছুধে-আলতা রঙ একেবারে। মা বলতেন-'বসরাই গোলাপ'।

মেন্তির সঙ্গেই আমার ভাবটা বেশি হয়ে গিয়েছিল।

তার কারণ ওর দাদারা বিশেষ বাড়ি থাকত না, থাকলেও এমন গুণ্ডা-গুণ্ডা চেহারা আর ভাবভঙ্গি তাদের যে, কাছে ঘেঁষা যেত না, মুখের দিকে চাইলেই বুকের রক্ত জল হয়ে যেত। খেন্তি মার সঙ্গে সঙ্গে থাকত বেশির ভাগ—রান্নার পরও বসে সারা ছুপুর-বিকেল মার সঙ্গেই কাগজের ঠোঙ্গা তৈরী করত। এক দোকানদার কাগজ দিয়ে যেত আবার ঠোঙ্গা বুঝে গুণে নিয়ে পয়সা দিয়ে যেত, সুতরাং খেন্তির পাত্তাই পাওয়া যেত না। মেন্তিকে খুব ভারী কোন কাজ দেওয়া যেত

না বলেই তার একটু অবসর ছিল—আমার সঙ্গে গল্প করার।

শান্ত সুশ্রী মেয়েটি, হাসি-হাসি মুখ—গল্প বলার জন্যে তাগিদ করত, তাও ভয়ে ভয়ে, চুপি চুপি।

মেন্তির কথাটা মনে পড়লেই সেই ছবিটা আগে মনে আসে।···

মাস-ছয়েক বোধহয় ওখানে খেয়েছিলেন মা।

তারপর, ডাক্তারের নিষেধ অগ্রাহ্য ক'রেই হাঁড়ি-হেঁসেল ধরলেন আবার।

আমাদের কষ্ট হচ্ছিল, তাছাড়া মার পক্ষেও বারো মাস অতদূর হেঁটে যাওয়া সম্ভব নয়—বর্ষায় তো ঠায় ভিজে ভিজে যাওয়া। তখন মহিলারা বিশেষ ছাতি ব্যবহার করতেন না। ঘরে রান্নার ব্যবস্থা না হলে চলেনা।

তবে তাতে ক'রে মেন্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ একেবারে ছিন্ন হয় নি। গোসাঁইগিন্নীর কি রকম আত্মীয় হতেন ওঁরা। তাই খবর পাওয়া যেত মধ্যে মধ্যে।···

বছর দুই পরে হঠাৎ শোনা গেল—খেন্তির বিয়ে।

'সে কি!' মা চমকে উঠলেন, 'ওমা, খরচ কে দেবে? আর এই তো ওর সবে তেরো বছর বয়স!'

'তা হোক।' গোসাঁইগিন্নী বললেন, 'তেরো বছরে আমার কোলে ছেলে এসে গেছে। তাছাড়া, একটা যোগাযোগ হয়ে গেল—কোনমতে পার হয়ে যায় সে-ই ভাল। নইলে কে উয্যুগী হয়ে দাঁড়িয়ে ওর বে দেবে তাই শুনি? ঐ গাঁজাগুলিখোর পিচেশ ভাইগুলো?'

'তা খরচ?' মা পুনশ্চ প্রশ্ন করলেন।

'তারা এক পয়সাও নিচ্ছে না। আর নেবে কি—তেজবরে বর!··· প্রথম পক্ষের একটা মেয়ে ছিল—গেল মাসেই তার বে দিয়ে দিয়েছে—বোধহয় নিজে আর-একটা বৌ কাড়বে বলেই—দ্বিতীয় পক্ষেরও দুটো বাচ্চা আছে, তাই বলে বয়েস বেশি নয়, চল্লিশ হবে—কি আর দু-এক

বছর বড়জোর। রেলে কাজ করে, এলাহাবাদ আতরসুইয়াতে নিজেদের বাড়ি—সে-সব আমি খোঁজ নিয়েছি। লোকটা ভাল। গয়নাপত্তর সব সে-ই দেবে, আশীর্বাদের দিনই দিতে চেয়েছিল, আমিই বলেছি, খবরদার, চোখের সামনে সোনা দেখলে গুণ্ডাগুলো কি আর এক কুঁচিও রাখবে! ঐ সম্প্রদানের সময়ই পরিয়ে দেবে একেবারে।'

'তা ঘর-খরচ? দানসামিগ্‌গির?'

মা তবু যেন বিশ্বাস করতে চান না কথাটা।

'সে হয়েই যাবে একরকম করে, ভিক্ষেদুঃখ্যু করে, মেগেপেতে। কন্যেদায় কি আর ঐ জন্যে আটকে থাকে?...দু-এক টাকা ক'রে দিচ্ছে সবাই—তোর কাছেও আসবে এখন, ভয় নেই!'

হাসলেন গোসাঁই দিদিমা।

তেরো বছরের মেয়ে, চল্লিশ-বিয়াল্লিশের বর, তাও তিনটে ছেলেমেয়ে সুদ্ধ।

মা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন শুধু।

উপায় যে কিছু নেই এছাড়া—তা তিনিও বুঝছেন। গোসাঁইগিন্নী আরও একটা কথাতে সব মুখ মেরে দিলেন, 'আর কিছু না হোক, ছুঁড়িটা দুবেলা পেটভরে খেতে পাবে তো অন্তত—দস্যি দাদাদের অষ্টপ্রহর ঐ হুম্‌কী আর দুদ্দাড় মার থেকেও বাঁচবে। সেও কম নয়।'

সত্যিই মেগেপেতে একরকম ক'রে বিয়েটা হয়ে গেল।

আমরাও গিয়েছিলাম। বেশ বর—সৌম্য শান্ত ভদ্রলোক, দু-এক গাছা চুলে পাক ধরেছে, তবে বুড়ো নয়। খেন্তি বেঁচে গেল সত্যি-সত্যিই। অনেকদিন পরে একবার ওদের আতরসুইয়ার বাড়িতে গিয়েছিলাম খুঁজে খুঁজে—দেখেছিলাম ভালই আছে খেন্তি। খুব একটা স্বচ্ছল অবস্থা নয়, তবু শান্তিতে আছে। ওরও দুটো ছেলে হয়েছে, সতীনপোরাও খুব বশ, নিজের নয়—তা বোঝা যায় না।

খেন্তির বিয়ের বছর দুই পরেই আমরা কলকাতা চলে এলাম, কাশীর সঙ্গে যোগাযোগ নষ্ট হয়ে গেল অনেকখানি।

তবে চিঠিপত্র আসাযাওয়া ছিল, তাইতেই একসময় খবর পেলাম মেন্তিরও খুব ভাল বিয়ে হয়ে গেছে।

একেবারেই দৈবাৎ, গঙ্গার ঘাটে ওকে দেখে বরের মা নাকি বাড়ি বয়ে এসে সম্বন্ধ করেছেন। এক পয়সা তো নেনই নি—উল্‌টে এদের ঘরখরচাও নাকি তাঁরা দিয়েছেন।

বৃন্দাবনে ভৃঙ্গারবটের গোসাঁইবাড়ি বিয়ে হয়েছে, হীরের মুকুট পরিয়ে বৌকে নিয়ে গেছে তারা। মথুরা থেকে নাকি হাতীঘোড়ার রেশেলা করে বর-বৌ বাড়ি ফিরেছে।

খবরটা শুনে আশ্চর্য হইনি আমরা।

অমন সুন্দরী মেয়ে—যে দেখবে তারই পছন্দ হবে।

চোখ নাক মুখ হয়ত অত কাটা কাটা নয়, তবে সবই মানানসই, রং-এর তো কথাই নেই, গড়নও বেশ সুডৌল।

আর সবচেয়ে যা চোখে লাগে, সে ওর শান্ত বিনম্র ভাব। তার সঙ্গে মুখের হাসি-হাসি ভাবটি।

মা খুবই আনন্দ করলেন খবর পেয়ে। বললেন, 'দিদিকে ভগবান অসুমর দুঃখ দিয়েছেন—তবু, মেয়ে দুটোর যে ভাল হিল্লে হ'ল—এইটেই একটু মুখ তুলে চাওয়া বুঝতে হবে। আহা, এমন মানুষটার কী দুঃখু, সত্যি!···ভগবান একদিক ভাঙ্গেন একদিক গড়েন—জামাই দুটো ভাল হল সেইটেই সুরাহা। বুড়ো বয়সে মেয়েরাই দেখবে।'······

এর বছর দুই পরে বৃন্দাবনে গেলাম। মার অতটা মনে ছিল না, আমিই তাঁকে মনে করিয়ে দিলাম, 'এইখানেই কোথায় মেন্তির বিয়ে হয়েছিল না?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, তাও তো বটে। ভৃঙ্গারবটের গোসাঁইবাড়ি বলে শুনেছি—'

ব্রজবাসী বা পাণ্ডাকে বলতে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ মা, ওতো এক প্রধান দর্শন। আমি এমনিই নিয়ে যেতাম। যমুনার ধারে—ভারী ভাল জায়গাটা।'

দশ-বারো দিন পরে একদিন বিকেলে ব্রজবাসী সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেলেন ভৃঙ্গারবটে। যমুনার ধারে বেশ বড় বাড়ি, ঠাকুরবাড়ি আর গোসাঁইদের বসত বাড়ি লাগোয়া।

আমরা যখন গেলাম তখন মন্দির একেবারে জনহীন, কোন পূজারী কি দর্শনার্থী—কেউ নেই। মা দর্শন ক'রে নাট মন্দির থেকে উঠানে নেমে একটু বিমূঢ়ভাবেই এদিক ওদিক চাইছেন—কাকে ধরে খোঁজ-খবর করবেন ভাবছেন—কোথা থেকে ঝড়ের মতো ছুটতে ছুটতে এসে মেন্তি একেবারে মাকে জড়িয়ে ধরে হু-হু ক'রে কেঁদে উঠল, 'ওগো মাসিমা গো, এদ্দিন পরে আমাকে মনে পড়ল তোমার। সব্বাই—মা সুদ্ধ আমাকে ভুলে গেছে, কেউ খবর নেয় না—। কেন, আমি কী করেছি!'

'ওরে থাম্ থাম্, চুপ কর্। কাঁদছিস কেন, এই ছ্যাখো পাগল—' মা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

কিন্তু ইতিমধ্যেই কোথা থেকে সেই রঙ্গমঞ্চে আর একটি মানুষের আবির্ভাব ঘটেছিল আমরা কেউ টের পাই নি।

মধ্যবয়সী একটি স্ত্রীলোক, গৌর বর্ণ, বয়সকালে হয়ত রূপসীই ছিলেন —নাকে তিলক, গলায় কণ্ঠী, দামী থান-ধূতি পরনে—হাতে কুঁড়োজালিতে মালা—জপ না হলেও ঘুরে যাচ্ছে।

কখন এসেছেন, মেন্তির সঙ্গেই কি না, কেউ দেখি নি। কিন্তু যিনি এসেছেন তিনি নিজের উপস্থিতি বুঝিয়ে দিতে জানেন। একেবারে যখন তাঁর চাপা অথচ তীক্ষ্ণ কণ্ঠ বেজে উঠল, তখনই চমকে চেয়ে দেখলুম।

'বলি আপনারা—আপনি এর কে হন জানতে পারি কি?' প্রশ্নটা মার দিকেই ফিরে।

অত্যন্ত শান্ত কণ্ঠস্বর, বড বেশী শান্ত। শান্ত না বলে বরং শানিত বলাই উচিত।

আমরা সবাই চমকে উঠলেও আশ্চর্য পরিবর্তন দেখলুম মেস্তির।

নিমেষে যেন শিটিয়ে কাঠ হয়ে উঠল সে। তখনও সন্ধ্যা হয় নি, দেখার কোন অসুবিধে নেই—সমস্ত মুখখানাও সেই সঙ্গে বিবর্ণ রক্তহীন হয়ে গেল।

এমন অবস্থা সবটা জড়িয়ে যে—মনে হ'ল এখনই অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবে সে।

আর সেই সময়ই আমার চোখে পডল তার একান্ত দীন বেশ।

হীরের টায়রা মাথায় হাতীতে চড়ে যে বৌ এ-বাড়ি এসেছে—তার এ বেশভূষা একেবারেই বে-মানান। সাধারণ একখানা আধময়লা মিলের শাড়ি পরনে, হাতের শাঁখার সঙ্গে একগাছি ক'রে চুড়ি। এ ছাড়া সম্পূর্ণ নিরাভরণ, গলায় এক ছডা হার পর্যন্ত নেই! চেহারাও—এবার ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখলুম—বেশ খারাপ হয়ে গেছে। রোগা তো হয়েছেই, অমন দুধে-আলতা রঙ, তারও সে জেল্লা নেই আর।

অর্থাৎ এখানে সে সুখেও নেই, স্বচ্ছন্দেও নেই।

মার এত সব লক্ষ্য করার অবসরও মিলল না, তিনি এই আকস্মিক প্রশ্ন ও প্রশ্নের ধরনে থতমত খেয়ে গিয়ে জবাব দিলেন, 'আমি—এই সম্পর্কে ওর মাসী হই।'

'ভাল। মাসী মানে তো গুরুজন, গুরুজন নিজেদের মেয়েকে সৎশিক্ষা দেবেন এইটেই তো আমরা আশা করব। বাপের বাড়িতে কোন শিক্ষাই পায় নি—তাই এমন করে ছুটে বেরিয়ে এসে কথা বলে ও, কিন্তু আপনি কোন্ আক্কেলে সেটার প্রশ্রয় দিলেন? যতই হোক, এটা বারমহল, অন্য মহাজনের যেমন ব্যবসার গদী হয়, এটাও আমাদের তাই। বলি আমাদেরও তো এটা এক রকমের কারবার ছাডা কিছু নয়, ঠাকুরকে ভাঙ্গিয়ে খাওয়া

আমাদের—এখানে নানা রঙের লোক আসছে-যাচ্ছে, কত জাতের কত রীত-চরিত্রের লোক—এটা কি কুলের বৌয়ের সঙ্গে দেখা করার মতো জায়গা ?'

এই প্রথম দেখলুম মা একেবারে নির্বাক হয়ে গেলেন। বেশ একটু সময় লাগল আক্রমণের বেগটা সামলে নিতে :

তার পর বললেন, 'কিন্তু আমি তো ঠিক এখানে দেখা করব বলে আসি নি, ভেতরেই যেতুম খোঁজ করতে—ও এসে পড়ল বলেই—তাও তো বোধহয় এক মিনিটও হয় নি।'

'আধ মিনিটই বা হবে কেন মা, আপনি ওর কথার জবাবই বা দেবেন কেন। ও না হয় অলবড্ডে ধাঙ্গড়ী, বাপের বাড়িতে কোন শিক্ষা-দীক্ষাই পায় নি, বড় বংশের মান ইজ্জৎ বোঝার কথা নয় ওর—কিন্তু আপনার তো জ্ঞান বুদ্ধি হয়েছে, আপনার কি তখনই উচিত ছিল না—একটিও কথা না বলে ওকে ভেতরে পাঠিয়ে দেওয়া কিম্বা নিজেই বেরিয়ে চলে যাওয়া ?···আপনি ওর কী রকম মাসী হন তা জানি না, তবে যদি ওর মার সঙ্গে কোনদিন দেখা হয় তো বলবেন, বামন হয়ে চাঁদে হাত দিতে আসা ঠিক হয় নি, এ-বাড়িতে ওঁদের মতো ঘরের মেয়ে দেওয়া অন্যায় হয়েছে।'

এর মধ্যেই পা-পা করে মেস্তি ভেতরে চলে গেছে। আমি লক্ষ্য ক'রে দেখলুম পা দুটো ওর ঠক ঠক ক'রে কাঁপছে।

এই অন্যায় আক্রমণের প্রতিবাদে একটি কথাও বলার সাহস হল না ওর—এমন কি যাওয়ার সময় আমাদের দিকে একবার তাকিয়ে দেখারও না।

এতক্ষণে কিন্তু মা নিজেকে সামলে নিয়েছেন।

তাঁর রগের দু পাশের শিরা দুটো ফুলে ওঠা দেখে বুঝলুম ভেতরে ভেতরে তাঁর রাগ চড়ছে। তিনি বললেন, 'দেবার কথা কেন তুলছেন, শুনেছি তো আপনারাই উপযাচক হয়ে এনেছেন।'

'অন্যায় হয়েছে, ঘাট হয়েছে। মানছি তা। তবে একটা অন্যায় তো আর একটা অন্যায়ের কৈফিয়ৎ হতে পারে না মা। আমার মা বুড়ো মানুষ, বুড়ো হলে মতিভ্রম হয়—দেখে পছন্দ হয়েছে তো গলে গেছেন একেবারে। তাছাড়া শুনেছেন নাকি বড় বংশ, ওর মা নাকি গোসাঁই ঘরেরই মেয়ে, কোন সহবৎ-শিক্ষাই যে মেয়েকে দেয় নি তা মার পক্ষে ভাবার কথাও নয়। এমন যে ডাহা ময়লায় হাত পড়েছে, নেশাখোরদের বাড়ির আবর বেতরবিয়ৎ মেয়ে, কোন রকমের শিক্ষাই পায় নি সেটা তো আমরা বিয়ের পর জানলুম। আমাদের এমনভাবে ধোঁকা দেওয়াও উচিত হয় নি আপনার বোনের।'

'তা আপনি ওর কে হন জানতে পারি কি?' মাও বেশ যেন শানিত কণ্ঠেই প্রশ্ন করলেন।

'আমি ওর বড় ননদ হই, বরের বড় দিদি।'

'তা হলে তো ওর মা আপনারও গুরুজন হন। তাঁর সম্বন্ধে যে ভাষা ব্যবহার করছেন—তাতেও তো খুব শিক্ষা কি সহবৎ প্রকাশ পাচ্ছে না।'

এবার মুখোশটা একেবারেই খসে পড়ল, মহিলা বিষাক্ত কণ্ঠে বললেন, 'ছোটলোকে আর ভদ্দরলোকে কুটম্বিতে হয় না। অমনতর লোককে আত্মীয় কুটুম বলে স্বীকার করলে আমাদের আত্মীয়-মহলে কি শিষ্য-সেবকদের কাছে মুখ দেখাব কি ক'রে?······যাক, এসেছেন, দাঁড়ান এইখানে—প্রসাদ পাঠিয়ে দিচ্ছি নিয়ে যান।'

এই বলে বাতাসে ঈষৎ আতরের সুগন্ধ ছড়িয়ে তিনি সেই পাশের দ্বারপথেই ভেতরে চলে গেলেন।

বলা বাহুল্য, আমরা আর ওঁর প্রসাদের জন্যে দাঁড়াই নি। উদ্দিষ্ট বিগ্রহকে প্রণাম জানিয়ে বেরিয়ে এসেছিলাম।

মার দুই চোখ তখন ঝাপ্‌সা হয়ে এসেছে। ঐটুকু দুধের মেয়ে—এই চেড়িদের হাতে কত নির্যাতনই না সইছে, ভেবে তাঁর চোখের জল

আর বাধা মানছিল না। মনে হ'ল এ-যাত্রা এই তীর্থ-ভ্রমণটাই তাঁর বিষাক্ত হয়ে গেল।

এর পর বহুদিন আর ওদের কোন খবর পাই নি।

অনেক ক'বছর পরে আবার কাশীতে এসে মাসখানেক থাকতে হয়েছিল। সেই সময়ই মনে পড়ল মেন্তি বেচারীর কথাটা।.........খবর নেওয়াও শক্ত, গোসাঁইগিন্নী যদিচ তখনও বেঁচে আছেন শুনলুম, তবে সে আগের বাড়িতে আর থাকেন না। ননদ মারা যেতে কোন্ এক আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়ে উঠেছেন।

তবু বিস্তর চেষ্টা-চরিত্র ক'রে খুঁজে বার করলুম একদিন।

অনেক বয়স হয়েছে, তালগোল পাকিয়ে গেছেন একেবারে, বহুক্ষণ ঘোলাটে চোখে তাকিয়ে থেকে তবে চিনতে পারলেন। মেন্তির কথা জিজ্ঞাসা করতেই কেঁদে ফেললেন, বললেন, 'ওরে তার দুর্দশার কথা আর বলিস নি—কি কপাল ক'রে যে এসেছিল মেয়েটা—এমন বরাত যেন অতিবড় শত্তুরও না ক'রে আসে। খুব বে দিয়েছিল মা মাগী, শ্বশুরবাড়ি তো নয়—জবাই হবার জন্যে সাক্ষাৎ কসাইদের বাড়ি দিয়েছিল।......এর চেয়ে গায়ে তেল ঢেলে পুড়িয়ে মারাও ভাল ছিল। বরটা গাড়ল, আধা পাগলের মতো, শাশুড়ী মাগী মেয়েদের ভয়ে কাঁটা—ঐ রহলা-দহলা দুই বিধবা বোনই সংসারের আসল গিন্নী। সোন্দর বৌ আসতে দেখেই ওদের মাথা খারাপ হয়ে গেছল, ভেবেছিল এবার ভাই বোধহয় বৌয়ের বশ হয়ে পড়বে। তাই সেই প্রেথম থেকেই আদাজল খেয়ে লেগেছিল। সেই যা বে'র ক'দিন, তার পর থেকে কোনদিন একটা গয়না কি একখানা ভাল কাপড় পরতে দেয় নি। ঝিয়ের মতো রেখেছিল। পেট ভরে নাকি খেতে পজ্জন্ত দিত না! তাই যে রাত্তিরটা একটু শান্তিতে কাটবে—তারই কি জো আছে—বরের সঙ্গে শোওয়ার হুকুম ছিল না। বড় ননদের সঙ্গে

শুতে হ'ত। ক্রী সমাচার, না ছেলেমানুষ বৌ, এখন পোয়াতি হলে বাচ্ছা রুগ্ণ হবে! আরও জো পেয়ে গিয়েছিল—বাপের বাড়ির তো কোন জোর ছেল না, তত্ত্বতাবাস কি একদিন খোঁজ খবরও কেউ করত না। ওরা বুঝে নিয়েছিল যে কোন চুলোয় কেউ নেই, দু পায়ে থ্যাঁতলাব, তা-ই সহ্য করবে।'

বলতে বলতে হাঁপিয়ে গিয়েছিলেন গোসাঁইগিন্নী। খানিক চুপ ক'রে থেকে দম নিয়ে আবার বললেন, 'ওরা একটা ছুতো খুঁজছিলই, ওরই অদেষ্টে সে ছুতো ঘরে গিয়ে পঁউছাল। তোরা নাকি একদিন দেখা করতে গিয়েছিলি বিন্দাবনে,—সে-ই উত্তম সুযোগ মিলল। তোর সঙ্গে বদনাম তুলে দিলে, বললে কিনা ঐ ছোঁড়ার সঙ্গে খুব ভাব ছেল, বে'র আগেই ওর সঙ্গে নষ্ট হয়েছে। তাই দিনরাত এমনধারা মনমরা হয়ে থাকে, ফোঁস ফোঁস ক'রে নিশ্বেস ছাড়ে, বরের সঙ্গে শুতে চায় না। যতই আমরা বারণ করি—ডব্‌কা মেয়ে—পেছটান না থাকলে ঠিক বরের সঙ্গে ভাব ক'রে নিত। বলি আমরা তো আর দিনরাত পাহারা দিই না। গাই-বাছুরে ভাব থাকলে বনে গিয়ে পিইয়ে আসে। আসলে ওর মন পড়ে আছে ঐ রসালো নাগরের কাছে। মাসী না ছাই, বামুন শুদ্দূর তফাৎ লোক কথায় বলে, বামুনের আবার কায়েৎ মাসী কি?·········
বোঝ্ কথা, নিজেরা বজ্জর আঁটনে বেঁধে রেখেছে—দোষ হল বোয়ের। ঐ একরত্তি মেয়ে, আর ইদিকে দুই দজ্জাল ননদ, তার সাধ্যি কি ওদের চোখ এড়িয়ে বরের কাছে যায়!'

আমি ব্যাকুল হয়ে উঠি, 'কিন্তু আমরা যে এক বয়িসী দিদিমা!'

'সে কি আমি জানি নি? আসলে ওটা তো ছুতো বৈ কিছু নয়। সেই কথামালায় পড়িস নি, দুরাত্মার ছলের অভাব হয় না? তোর শত্তুর মুখে ছাই দিয়ে ছাওয়ালো গড়ন তো, বলে ওর কম্‌সে কম উনিশ কুড়ি বছর বয়েস হবে।—তা শোন্, মেয়েটার দুর্গতি, সেই বদনাম তুলে

ভাইটাকে বোঝালে এ নষ্ট মেয়েমানুষ ঘরে থাকলে ঠাকুরের কোপ লাগবে—কোন শিষ্য-সেবক আর থাকবে না। তাকে অমনি বোকা বুঝিয়ে দারোয়ান ঝি সঙ্গে দিয়ে এক কাপড়ে মেয়েটাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিলে।···মা মাগী তো ঐ হাবাগোবা, আর কীই বা করবে, পয়সা তো নেই যে নালিশ মকদ্দমা করবে কি গিয়ে ঝগড়া করবে। দুই মায়ে ঝিয়ে চোখের জলে ভাত মেখে খেতে লাগল,—যাকে বলে!'

একটানা বলতে পারেন না গোসাঁই দিদিমা, হাঁপ ধরে। তবু বিশ্রামও নিতে পারেন না বেশীক্ষণ। কথাগুলো যেন অনেকদিন ধরে জমে ছিল, বুকের মধ্যে। বার করে না দিতে পারলে ছুটিও নেই শান্তিও নেই।

তাই এক মুহূর্ত থেমেই আবার বলেন, 'তাতেই কি দুগ্‌গতির শেষ হ'ল? ওদিকে তো গোয়ারের একশেষ। ইদিকে ঐ গুণধর মাতাল ছোট দাদাটা, মটরা—বোনটা দিব্যি দেখতে হয়েছে দেখে—দালাল লাগিয়ে এক তান্ত্রিক সাধুর কাছে বেচে দিলে। একদিন সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেল কাপড় কিনে দেবে বলে—আর পাত্তা নেই। মা কান্নাকাটি করলে তেড়ে আসে, বলে দুখানা ক'রে কেটে ফেলব, তোর মেয়ে বেরিয়ে গেছে—আমি কি করব!···কী হয়েছে কেউ কি টের পেতুম? নিহাৎ ছোটর হাতে অনেক পয়সা এসেছে—দুহাতে খরচ করছে, খুব নপ্‌চপানি—দেদার মদমাংস চল্‌ছে দেখে বড় দুজনার খুব হিংসে হ'ল, একদিন খুব ঝগড়াঝাঁটি দাঙ্গা—তাতেই অমানুষিক মারের চোটে প্রেকাশ পেল কথাটা।···তা তখন আর চারা কি, কোথায় সে সাধু থাকে কি বিত্তান্ত কেউ জানে না, আর কার কি গরজই বা—ও মেয়ে ঘরে ফিরিয়ে এনেই বা কি করবে? তার কি আর কিছু আদায় আছে? বলে উত্তর-সাধিকা—আসলে নষ্ট করা ছাড়া তো কিছু নয়! আর বোনের জন্যে ওদের দুখদরদেরও সীমে নেই, ওদের তো ঘুম হচ্ছে না একেবারে। ত্যাখন পয়সার গন্ধ পেয়েছিল

তাই অত দরদ। মটরাটা নাকি অনেক পয়সা খেয়েছিল, এমন তো পাওয়া যায় না। বামুনের সধবা মেয়ে অথচ সোয়ামীর সঙ্গে সম্পর্ক হয় নি—এ যে তান্ত্রিকদের কাছে দুল্লভ জিনিস একেবারে। ওদের কী সব তপিস্যে আছে, তাইতে লাগে।'

এই পর্যন্ত বলে চুপ করলেন গোসাঁই দিদিমা। অনেক বকেছেন, আর তাঁর সাধ্যও নেই, এইতেই হাপরের মতো হাঁপাচ্ছেন বসে।

কিন্তু আমার আর তখন ধৈর্য মানছে না, আমি বললুম, 'তারপর ? আর কোন খোঁজই পাওয়া যায় নি ?'

'কে খোঁজ করবে বল ? ও মেয়েকে দিয়ে তো আর কোন কাজ হবে না, শুধু শুধু গলায় পাথর ঝোলাতে যাবে কে ? আগুনের খাপরা মেয়ে—আগলাতেই প্রাণান্ত। আর মা মাগী বেঁচে থাকলেও তবু কথা ছিল, তার মায়ের প্রাণ—হাঁকড়-যাকড় করত।'

'ও, মাসিমা মারা গেছেন ?'

'বেঁচেছেন বল ! হাড় জুড়িয়েছে। কিছু তো ছেল না দেহে, কোন-মতে ধাধসে কাজ ক'রে যেত। তার ওপর এই আঘাতটাতে একেবারে শেষ ক'রে দিলে। ছোট মেয়ে, কোলের সন্তান।···কে জানে ইচ্ছে ক'রে কি না, কিম্বা কেউ ধাক্কাই দিয়েছে, কিম্বা মাথাই ঘুরে গেছে—একটা সুয্যি-গেরনের দিন নাইতে গেল গঙ্গায়—আর ফিরল না। ডুবেছে কি না—কেউ লক্ষ্যও করে নি অত, ভীড়ে কে কার খবর রাখছে বল ! পরের দিন মড়াটা গিয়ে পঞ্চ-গঙ্গার কাছে আটকে ছিল—পুলিশ তুলে ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে সনাক্ত করাল।···বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে ! শুধু শুধু বেঁচে থেকে আরও খানিক বিড়ম্বনা ভোগ করা বৈ তো নয় ! এই তো আমাকেই ছাখ না—'

এইবার নিজের উনপঞ্চাশ রকমের রোগের ফিরিস্তি দিতে বসলেন তিনি। কোনমতে আরও মিনিট দশেক বসে হুঁ হাঁ দিয়ে 'আবার

আসব' বলে উঠে পড়লুম।

সে যাত্রা আর হয় নি। আরও বছর খানেক পরে গিয়ে খুঁজে বার করেছিলুম মেন্তিকে। বিস্তর ঘোরাঘুরি করতে হয়েছিল অবশ্য। মেজ ভাই ভোঁদাকে এক বোতল আধাবিলিতি মদের দাম কবলাতে সে নাম-ঠিকানা বলেছিল, তবে সে ঠিকানায় পাওয়া যায় নি। অনেকদিন আগেই নাকি তারা সেখান থেকে চলে গিয়েছে। কেউ বললে, আদি কেশবের দিকে, কেউ বললে গৈবির কাছে। শুধু একজন বললে, বিন্ধ্যাচলে অষ্টভূজার পাহাড়ের কোলে ঘর বেঁধে থাকেন সে সন্ন্যাসী। খুব উঁচু দরের সাধু, রাতকে দিন করতে পারেন ইচ্ছে করলে। তাঁর ভৈরবী মাও খুব বড় সাধিকা, দুর্গা-প্রতিমার মতো চেহারা, তেমনি শক্তি। সাক্ষাৎ অষ্টভূজাই। ইত্যাদি—

ঐ ঠিকানাতেই পাওয়া গেল।

তখন এত বাস্-এর সুবিধে ছিল না, মির্জাপুর থেকে এক্কা ক'রে যাওয়া, পৌঁছে খুঁজে বার করতে করতে সন্ধ্যে উৎরে গেল।...একটা সামান্য ঝোপ্ড়ার মতো ঘর, পাতা-লতা দিয়ে তৈরী, ওপরে বোধহয় ঘাসেরই চালা। দরজা বন্ধ ছিল, তবে পাতার ফাঁক দিয়ে আলো আসতে দেখে ভরসা ক'রে আস্তে দরজায় ধাক্কা দিলুম।...একটু ভয়ই করছিল, কী রকম তান্ত্রিক সাধু কে জানে, হয়ত ত্রিশূল কি খাঁড়া নিয়ে তেড়ে আসবে।

কিন্তু দরজা খুলে আলো হাতে যে বেরিয়ে এল, সে সাধু নয়—সাধিকা, ভৈরবী স্বয়ং। সে মেন্তিই।

অনেক পরিবর্তন হয়েছে তার। সেদিনের সে শীর্ণ ত্রস্তা মেয়েটি আজ পূর্ণ-যৌবনা, দীপ্তিময়ী। সেদিন যাকে কোন মতে সুশ্রী বলা চলত, আজ সে রূপসী। তবে সাধারণ অর্থে নয়, সেই লোকটিই ঠিক বলেছিল,

সত্যিসত্যিই এ রূপ দেবী-প্রতিমার মতো। তার মুখেচোখে এমনই একটি শান্ত সমাহিত ভাব, যে দেখলে শ্রদ্ধাই জাগে, লালসা নয়।

তার পাশ দিয়ে ঘরের মধ্যেটাও দেখে নিয়েছি এক নজর, সেখানেও আলো জ্বলছে, বেশ জোর—একটি বড় প্রদীপে। তার সামনে একটা বাঘছালের ওপর সেই বাঘের মাথাই উপাধান ক'রে শুয়ে আছেন দীর্ঘদেহ একটি পুরুষ।

বাঙ্গালী নয় খুব সম্ভব, কারণ এমন বলিষ্ঠ দেহ বাঙ্গালীর মধ্যে দুর্লভ। তাঁরও উজ্জ্বল গৌর বর্ণ। বড় বড় দাড়ি গোঁফ, একমাথা ঝাঁকড়া চুল—কাঁচা-পাকায় মেশা, তবে পাকার ভাগই বেশী। প্রশস্ত লোমশ বুকে মোটা রুদ্রাক্ষের মালা, কপালে রক্তচন্দনের আঙ্গুলে টানা প্রলেপ, তার মধ্যে একটি সিঁদুরের ফোঁটা। ভয়ঙ্কর আদৌ নন। বেশ একটু শ্রদ্ধারই উদ্রেক হয় তাঁর দিকে তাকালে। মুখে ঈষৎ কৌতুকমাখা প্রসন্ন হাসি—মনে হ'ল তিনি আমার প্রত্যাশাই করছিলেন, আর তাঁর জন্যে কোন বিরূপতা নেই মনে, বরং অভ্যর্থনা করতেই প্রস্তুত।···

কত কি বলার ছিল, কত কথা বলব বলে মনে মনে তৈরী হয়ে এসেছিলুম—কিছুই বলা হ'ল না। শুধু, কেমন একটু থতমত খেয়ে নামটাই উচ্চারণ করলুম, 'মেন্তি!'

একটু হাসল সে। প্রসন্ন মধুর হাসি। বলল, 'এস, ভেতরে এস। উনি এই একটু আগেই বলছিলেন যে, তোমার সেই বন্ধু আসছেন। চায়ের জল চড়াতে বলছিলেন।'

আরও যেন গোলমাল হয়ে গেল মাথার মধ্যেটায়। আত্মীয়তা করতে আসি নি, এ ধরনের অভ্যর্থনার জন্যেও না। বরং বিপরীত মনোভাব নিয়েই এসেছি। তাই কতকটা আমৃতা আমৃতা ক'রেই বললুম, 'আমি—আমি তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি মেন্তি।'

মেন্তি কোন বিস্ময় প্রকাশ করল না, প্রবল প্রতিবাদও করল না। শুধু
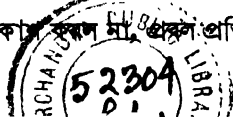
তেমনি শান্ত কণ্ঠেই প্রশ্ন করল, 'কোথায় ?'

'আ—আমাদের বাড়ি। আমার মায়ের কাছে থাকবে—।'

'তার পর ? কী করবে আমাকে নিয়ে ?'

'তুমি—মানে তুমি যাতে আত্মসম্মান বজায় রেখে স্বাভাবিক জীবন-যাপন করতে পারো—'

আবারও হাসল সে। এবার বেশ শব্দ ক'রেই। মনে হ'ল যেন সে এতক্ষণ ধরে আমার সঙ্গে পরিহাসই করছে।

'সেটা কি ভাবে হবে বলতে পারো ভূতু ? আমায় বিয়ে দিতে পারবে আবার ?…তুমি বিয়ে করবে ? পারবে ? সে সাহস আছে ? মা রাজী হবেন ? আলাদা সংসার পাততে পারবে আমাকে নিয়ে ? আর কিভাবে আত্মসম্মান বজায় রেখে স্বাভাবিক জীবন যাপন করব বলো ? এক চাকরি-বাকরি করা—আর নয় তো বিয়ে, তা তেমন লেখাপড়া জানি না যে চাকরি করতে পারব। এখন লেখাপড়া শিখে পাস ক'রে চাকরি করতে গেলে অন্তত সাত আট বছর লাগবে। এই সময়টা খাব কি, থাকব কোথায় ? তোমার বাড়ি থাকলে—যে মিথ্যে দুর্নামে আমাকে তাড়িয়েছিল তারা, সেই দুর্নামটাই সকলে বিশ্বাস করবে। আর যাই হোক সেটা আমি সইতে পারব না।'

এসব যুক্তির জন্যে প্রস্তুত হয়ে আসি নি। কোন রকম বিরোধিতার জন্যেও না। কল্পনা করেছিলুম—আমাকে দেখে মুক্তি পেল এই কথাই ভাববে, তখনই চলে আসতে চাইবে। বাধা যদি কেউ দেয় তো সে ঐ সাধুটাই দেবে। কেমন যেন মাথার মধ্যে গোলমাল হয়ে গেল সব। বেশ একটু উত্তেজিত হয়ে বলতে গেলুম, 'তাই বলে এই অসম্মানের মধ্যে জীবনটা কাটবে ? …না না, আমার জন্যেই তোমার এই লাঞ্ছনা, তুমি চলো—আমি যেমন ক'রে হোক চালাব !'

'যে মেয়ের বাপভাই অমানুষ, যাকে স্বামী নেয় না—তার তো বেঁচে

থাকাটাই অসম্মান—তাকে তুমি সম্মান ফিরিয়ে দেবে কেমন ক'রে? আর লাঞ্ছনা কে বললে তোমাকে?…এখনও অনেক জিনিস তোমার জানতে বাকী আছে ভূতু!…তবে সে সব কথা তোমাকে বোঝাতেও পারব না। এইটুকু শুধু জেনে রাখো, আমি ভালোই আছি। সুখে না হোক, ভোগ-বিলাসে না হোক—শান্তিতে আছি। পরম শান্তি।…না, আমার জন্যে দুঃখু করো না, উদ্ধার করারও চেষ্টা ক'রো না। বছর কতক আগে যদি আসতে তো শোভা পেত।…তখন—ইনি না দয়া করলে হয়ত সত্যিই বাজারে নাম লেখাতে হ'ত। ভায়েরাই রোজগার করাত।…এই একটা সুকৃতি ছিল, এঁর আশ্রয় পেয়েছি। তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে যাও, আমার জন্যে ভেবো না।'

কেমন একটা রাগ হয়ে গেল, সেই সঙ্গে অসহ একটা বিদ্বেষও ঐ লোকটা সম্বন্ধে, যে সেই থেকে নিঃশব্দে শুয়ে শুয়ে মুচকি মুচকি হাসছে। বললুম, 'আমি পুলিশ নিয়ে এসে তোমাকে নিয়ে যাব! কেউ আটকাতে পারবে না। ব্যাটা ভণ্ড—তোমাকে ভয় দেখিয়ে এসব শিখিয়ে রেখেছে!'

এবার খিলখিল ক'রে হেসে উঠল মেন্তি, 'ওমা, তুমি আমাকে পুলিশ ডেকে নিয়ে যাবে কোন্ অধিকারে? তুমি কোন্ অভিভাবক আমার?… আর উনি যদি ভণ্ডই হবেন তো এদ্দিন পরে তুমি আসছ খুঁছে খুঁজে—সেটা টের পাবেন কেমন ক'রে যে—শিখিয়ে পড়িয়ে রাখবেন?…ওসব পাগলামি ছাড়ো—ঘরে এসে বসো। চা খাও, চাই কি রাত্রের খাওয়াটাও সেরে যাও—কোথায় কি জুটবে তার ঠিক নেই। ছাখো, আমি নিজে রেঁধে খাওয়াব—!'

আর আমি দাঁড়াতে পারলুম না। এমন হার-মানা বোধহয় আর কখনও মানি নি, এমন অপদস্থ-বোধও করি নি।

এক্কায় চাপতে চাপতে শুনলুম—ভেতর থেকে মিষ্ট গম্ভীর কণ্ঠে

লোকটি বলছে, ‘ওঁকে আর টানাটানি ক’রো না তারা, এতটা উনি সইতে পারবেন না একদিনেই—’

এর বহুদিন পরে আর একবার দেখেছিলাম মেন্তি বা তারা ভৈরবীকে।

সেও কি একটা যোগের দিন, অহল্যাবাঈ ঘাটে নাইতে নামছি, সে স্নান ক’রে গঙ্গাজলের ঘটি হাতে চলে গেল। তেমনি স্থির সৌদামিনীর মতো রূপ, তেমনি আত্মসমাহিত ভাব। পরনে লাল কাপড়, হাতে গলায় রুদ্রাক্ষের মালা—কপালে সিদুঁরের ফোঁটা। ঘাটের ছুপাশে অসংখ্য লোক, পাণ্ডারা পর্যন্ত ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করছে।

যেতে যেতে আমার চোখে চোখ পড়ল একবার। মনে হ’ল—আমার অনুমান—কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে রইল ওর দৃষ্টি আমার চোখের ওপর, কিন্তু সে ঠিক কয়েক মুহূর্তই, আমাকে চিনতে পারল কিনা তা তার আচরণে বা দৃষ্টিতে প্রকাশ পেল না। যেমন যাচ্ছিল তেমনি শান্ত ধীর-ভাবেই সিঁড়ি দিয়ে উঠে চলে গেল।

গ্রন্থারম্ভ

॥ ১ ॥

এতক্ষণ যা বললুম—এ গল্পটা না বললেও হয়ত চলত।

আসল যে গল্প, যার গল্প বলতে বসেছি—তার সঙ্গে ও কাহিনীর খুব একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নেই। অন্তত বাইরের স্থূল সম্পর্ক।

দুই কাহিনীর যোগসূত্র অন্য। পৃষ্ঠপট কাল—একই। পাত্র-পাত্রীও কেউ কেউ। এরা আমারই দেখা লোক, আমারই আত্মীয় বা আত্মীয়-তুল্য। আমার জীবনে আজও এরা অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে।

যে সময়ের কথা বলছি—সে সময়ে এই শ্রেণীর মানুষগুলো একই রকম ছিল, একই ধরণের আচার-আচরণ ছিল তাদের।

যোগসূত্রটা সেইখানেই।

পৃষ্ঠপট আমার বাল্যের দেখা কাশী। অবশ্য সবটাই দেখা নয়, কিছুটা শোনাও। তবে সে দুইয়ে এক হয়ে গেছে স্মৃতিতে, কোনটা দেখা আর কোনটা শোনা—বেছে নেওয়ার উপায় নেই।

আপনাদের বয়স কত হয়েছে জানি না—ভয় নেই, বয়স জিজ্ঞেস ক'রে বিব্রত করব না, আমার বক্তব্য অন্য—মানে ১৯১০ থেকে ১৯৩০-এর মধ্যে যাঁরা কাশী গেছেন তাঁরা আমার রমেশ ঠাকুর্দাকে অবশ্য দেখেছেন। না দেখে উপায় নেই। কারণ কাশী যাবেন অথচ দশাশ্বমেধ ঘাটে যাবেন না, কিম্বা—বিশ্বনাথ দর্শন তো যেমন তেমন, বিশ্বনাথের গলিতে কাপড়, বাসন, খেলনার জন্যে ঘুরবেন না, দিনে দেখে তৃপ্তি হয় না তাই রাত্রেও একবার আরতি দেখার নাম ক'রে ঐ গলিতে ছুটবেন না—এ তো আর সম্ভব নয়।

সুতরাং ঐ সময় যাঁরা গেছেন, তাঁদের চোখে পড়েছে ঠিকই—আমার

রমেশ ঠাকুর্দার অপরূপ মূর্তিটি।

তবে লক্ষ্য করেছেন কিনা কথা সে আলাদা।

কারণ ওঁর রাজত্ব—রাজত্বই বলুন আর চৌহদ্দিই বলুন, ইংরেজী থেকে বাংলা করলে বলতে হয় ওঁর চরে বেড়াবার জায়গা—ঐ পাড়াটাই।

সে সময়কার দশাশ্বমেধের রাস্তা চিন্তা করুন। ঘাটে যেতে ডান দিকে একটা মস্ত ফটকের মধ্যে খানিকটা খোলা জায়গা, এককালে হয়ত কারও হাতীশাল ছিল কিম্বা আস্তাবল—ফটকের ঠিক উল্‌টো দিকের দেওয়াল জুড়ে বহুদূর বিস্তৃত এক বিশাল বটগাছ, তার নিচে স্তূপাকার কয়লা।

ওটা পাইনদের কয়লার দোকান ছিল। ভবানীদা ঐ পড়ো জমিটুকু ভাড়া নিয়েছিলেন, না এমনিই ভোগদখল করতেন তা বলতে পারব না, কেন না দোকান যে খুব একটা রৈ রৈ করে চলত তা নয়। মালও বেশী কিনতে পারতেন না ভবানীদা, এক ওয়াগন ক'রে কয়লা আসত, সেটা ফুরোলে আবার এক ওয়াগন। তাও মধ্যে মধ্যে একেবারেই ক'দিন থাকত না, খদ্দেররা শুকনো মুখে আনাগোনা করত।

এই দোকানেই মাসিক পাঁচ টাকা মাইনেতে খাতা লিখতেন আমাদের রমেশ ঠাকুর্দা, রমেশ মুখুজ্যে মশাই।

মানে খাতা লেখবারই কথা—তবে তা ছাড়াও ঐ পাঁচ টাকা দরমাহাতে অনেক কাজ করতে হ'ত।

ফটকের সামান্য আচ্ছাদনের নিচে তক্তপোশ পেতে তাতে একটা জরাজীর্ণ মাদুর বিছিয়ে কাঠের একটা ক্যাশবাক্সর ওপর খাতা খুলে বসে থাকতেন রমেশ ঠাকুর্দা।

খাতা মেলা থাকত, হাতে কলমও ধরা থাকত কিন্তু খাতা কতদূর লেখা হ'ত তা বলা কঠিন, কারণ আমি যখনই দেখেছি হয় খাতার ওপর ঢুলে পড়ে ঝিমোচ্ছেন, নয়ত উচ্চকণ্ঠে খদ্দেরদের সঙ্গে তকরার করছেন।

কার কত বাকী আছে, কত দিনের বকেয়া ; এমন করলে পাইনের

পোকে কারবার গুটিয়ে হিমালয় পাহাড়ে চলে যেতে হবে নাগা সন্ন্যিসী হয়ে ; পাঁচ আনা মণ কয়লা বেচে কত লাভ হয় যে এত ধার ফেলতে পারে দোকানদার ? 'কয়লা খারাপ ? হ'তেই পারে না। এই কয়লা এ টহরণে সবাই ব্যবহার করছে, কই কেউ তো কোনদিন 'কম্‌পেলেন' করে নি ! আসলে উনুন জ্বালাতে জানে না বাড়ির মেয়েরা, ভাবে গোচ্ছার ঘুঁটে দিলেই বনবন ক'রে উনুন ধরে যাবে। কই নিয়ে চলুন তো রমেশ মুখুজ্যেকে সে উনুন সাজিয়ে দিয়ে আসুক—কেমন উনুন না ধরে ! তেলফেল কিচ্ছু লাগবে না—উনুনটি সাজিয়ে স্রেফ নিচে একটি লম্প জ্বালিয়ে দিন, এক পয়সার লম্প, বাঁই বাঁই ক'রে আগুন উঠে যাবে। বলে, 'নাচতে জানে না নাবডিংরে, উঠোনটাকে বলে হেঁটেন ঠিকরে'।··· তা তো নয় বাবা, পয়সার তাগাদা করলেই কয়লা খারাপ হয়ে যায়।··· হুঁ হুঁ বাবা, ঢের বয়েস হল এই রমেশ মুখুজ্যের। দেখলও ঢের। পয়সার তাগাদা না করো—এই কয়লাই এক নম্বর ঝরিয়া হয়ে যাবে—টাকা চাও—চুনারের পাথর। '

বেশী কথা বলা স্বভাব ছিল রমেশ ঠাকুর্দার।

বয়সেরই ধর্ম, তবু মনে হয় অন্য বুড়োদের থেকেও একটু বেশী বকতেন উনি।

একটা উপলক্ষ পেলেই হয়, বকতে বকতে দুই কষে ফেনা জমে যাবে, হাঁপিয়ে পড়বেন—তবু বকুনি থামবে না। কথাও কইতেন সর্বদা চেঁচিয়ে—যেন ধমক দিয়ে দিয়ে। ওঁকে ঠাকুর্দা বলার পিছনেও এই অভ্যাসের ইতিহাস। প্রথম যেদিন ওঁকে পিছন থেকে ডেকেছি 'কাকাবাবু' বলে—কী বলব ভেবে না পেয়েই কথাটা বেরিয়ে গেছে—প্রচণ্ড এক ধমক দিয়ে উঠেছেন, তেড়ে মারতে আসেন এই ভাব, 'কাকাবাবু কে রে ছোঁড়া ? এইটুকু পুঁচকে ছেলে—কত বয়েস হ'ত তোর বাবার বেঁচে থাকলে তাই শুনি ? আমি তোর ঠাকুর্দার বয়িসী লোক, আমাকে কাকাবাবু বলা ?

ঠাট্টা করা হচ্ছে, না? কেন আমি কি খোকা সেজে থাকি বয়েস ভাঁড়িয়ে? জ্যাঠামশাইও তো বলতে পারতিস নিদেন?'

বলা বাহুল্য, তখন বয়স কম, রাগ হয়ে গিয়েছিল খুব। তাই জ্যাঠা-মশাই না বলে সেদিন থেকে 'ঠাকুর্দা' বলেই ডাকি।

আসলে ঠিক ঠাকুর্দার বয়িসী নন, ওটা বাড়িয়ে বলা। উনি কিন্তু তাতে আদৌ অপ্রসন্ন নন, বরং নাতি সম্পর্ক পাতানোয় রসিকতা করার সুযোগ হওয়াতে ভারী খুশী।

মানুষটা ঐ ধরনের ছিলেন, চেঁচিয়ে গল্প করছেন কিম্বা কাউকে ধমকাচ্ছেন, হঠাৎ তার মধ্যেই গলাটা নামিয়ে সেই কুৎকুতে চোখের একটা টিপে—একটু আদিরসাত্মক ইঙ্গিত কিম্বা দু'একটা খিস্তি না করতে পারলে ওঁর কথা বলে জুৎ হত না।

এখনও বোধহয় ঠিক ধরতে পারছেন না। চেহারার বর্ণনাটা পেলে হয়ত মিলিয়ে নেবার সুবিধে হবে।

আপনাদের মধ্যে যাঁরা বঙ্কিমবাবুর দুর্গেশনন্দিনী পড়েছেন (আগে হ'লে এ প্রশ্নই উঠত না, অক্ষর-পরিচয় আছে অথচ দুর্গেশনন্দিনী পড়ে নি—এমন লোক বিরল ছিল। এখন ক্লাসিক বই পড়াটা ফ্যাসনের বাইরে হয়ে গেছে) তাঁরা গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজকে স্মরণ করুন। বিদ্যাদিগ্‌গজের শ্রীচরণ দুটির সেই অমর বর্ণনা—অগ্নি কাষ্ঠভ্রমে পা দুখানি ভক্ষণ করিতে বসিয়াছিলেন, কিছুমাত্র রস না পাইয়া অর্দ্ধেক অঙ্গার করিয়া ফেলিয়া গিয়াছেন'!···আমার মনে হয় আমাদের রমেশ ঠাকুর্দাকে দেখেই বঙ্কিমবাবু ঐ বর্ণনাটি দিয়েছিলেন।

রোগা, কালো, একটু কোলকুঁজো—কালো মানে কয়লার দোকানেই ঠিক মানায় এমন কালো, মসীবর্ণ যাকে বলে—ছোট ছোট দুটি চোখ, বিস্ফারিত ক'রে চাইলেও রাত্রিবেলা যা ঠাওর হয় না এতই ছোট, সহসা

দেখলে চোখের জায়গায় ত্নটো ফুটো আছে শুধু মনে হয়। একমাত্র যা বলবার তা হচ্ছে খুব বেঁটে নয়, তালগাছের মতো ঢ্যাঙাও নয়, মাপিকসই দৈর্ঘ্য। চুল পাকা ধবধবে, তবে দাঁত—আমি শেষ যখন দেখেছি ওঁকে ১৯৩২।৩৩ হবে—তখন বোধহয় আশি পেরিয়ে গেছে ওঁর, উনি যা বলতেন অবশ্য সেই হিসেবে—তখনও বেশির ভাগ দাঁত অটুট।

দাঁত উঁচু যাকে বলে তা ছিল না, তবে বেশ বড় বড়, কোদালে দাঁত, বড় আর সাদা, হঠাৎ হেসে উঠলে অত কালো মুখে অতখানি সাদা—কেমন যেন ভয়াবহ বোধ হ'ত। এক কথায় গ্রহাচার্যরা যাকে শনির জাতক বলেন—হুবহু সেই চেহারা।

এ ছাড়াও কিছু ছিল বর্ণনা দেবার মতো—বঙ্কিমবাবুও যা লক্ষ্য করেন নি।

ত্নই কষে ফেকোপড়া ঈষৎ সাদা দাগ। কথা বলার সময় থুথু বা ফেনা জমত, বোধহয় তাতেই হেজে স্থায়ী ঘায়ের মতো হয়ে গিয়েছিল।…তার ওপর চোখের কোলে ক্রমাগত সুতোর মতো পিঁচুটি জমত, সে সম্বন্ধে বেশ অবহিতও ছিলেন। লোকের সঙ্গে কথা কইতে কইতেই সুকৌশলে আঙুলের ডগা দিয়ে সেই সুতোটি লম্বাভাবে টেনে বার করতেন। এ দৃশ্যে যে দর্শকদের মনে ঘৃণা হওয়া সম্ভব, এসব যে একটু আড়ালে সারতে হয়—এ জ্ঞানই ছিল না তাঁর।

এইবার মনে পড়ছে একটু একটু ক'রে? বর্ণনার সঙ্গে মিলিয়ে পাচ্ছেন?

এধারে কিন্তু যতই বদ-অভ্যাস থাক, ধুতি উড়ুনি (জামা পরতেন কদাচিৎ, কোথাও কোন বিশেষ জায়গায় যেতে হলে তবেই—শীতকালের জন্যে একটা রেলকর্মচারীর গরম কোট ছিল, পুরনো বাজার থেকে কেনা, খালি গায়েই সেটা চড়াতেন) এবং পৈতে—সর্বদা ধপধপ করত।

ধুতি উড়ুনি ফরসা থাকত—তার জন্যে ওঁকে অবশ্য কোন মেহনৎ করতে হ'ত না। আমার সতীদিদির গতর বজায় থাক, তিনি দু'তিন দিন অন্তরই ক্ষারে কেচে কর্তার ধুতি চাদর, নিজের পরনের শাড়ি এবং বিছানা ধপধপে ক'রে রাখতেন।

সতীদিদি—রমেশ ঠাকুর্দার সম্পর্কে সতীঠাকুমা বলাই উচিত, কিন্তু অত সুন্দর মানুষটাকে ঠাকুমা বলতে কেমন যেন লাগত, ঠাকুমা শব্দটার সঙ্গে বার্ধক্যের অবস্থাটা অঙ্গাঙ্গী জড়িত আমাদের মনে, আমরা সতীদিদি বা সতীদিই বলতুম, মা অবশ্য 'মা' বলেই ডাকতেন, তাঁর অত-শত ছিল না ;—ছিলেন ঠাকুর্দা মশাইয়ের বিপরীত একেবারে।

সুগৌর বর্ণ—হয়ত দুধে আলতা যাকে বলে তা নয়—কিন্তু গৌরী তাতে সন্দেহ নেই। 'গোরোচনা গোরী' যাকে বৈষ্ণব কবিরা বলেছেন, হলদের ওপর চড়া, হবতেলের রঙ, দুর্গা প্রতিমায় যে রঙ দেয় কুমোররা। বড় টানা-টানা দুটি চোখ, সপ্তমীর চাঁদের মতো মানানসই কপাল। ক্ষুর দিয়ে কামানোর মতো সরু সুন্দর দুটি ভুরু—[আবারও বৈষ্ণব কবির বর্ণনা মনে পড়ছে—'জোড়া ভুরু যেন কামেরি কামানো', বিখ্যাত কীর্তনিয়া রামকমল এই লাইনটি তিনবার তিন রকমে উচ্চারণ ক'রে আখর দেবার কাজ সারতেন,—'জোড়া ভুরু যেন কামেরি কামানো', 'জোড়া ভুরু যেন কামেরি কামান', 'জোড়া ভুরু যেন কামেরই কামআনো' !] এছাড়া কবির কল্পনার সঙ্গে মেলানো আলতামাখা দুটি ঠোঁট, তার ফাঁকে মুক্তোর মতো শুভ্র সুন্দর দাঁত। গঠনও তেমনি—রোগাও না মোটাও না, সব দিক দিয়েই মাপিকসই ; গোলালো গোলালো হাত-পা।

একেবারে সেই য়্যাণ্ডারসেনের রূপকথার গল্প—'বিউটি য়্যাণ্ড দ্য বীস্ট !' তারই প্রত্যক্ষ উদাহরণ এই স্বামী-স্ত্রী।

কিন্তু তবু, এমন সুখী দম্পতী, পরস্পরের প্রতি এমন গভীর প্রেম,

এমন পূর্ণ নির্ভরশীলতা—খুব কম দেখেছি আমি।

আজও, জীবনের এতগুলো বছর পেরিয়ে এসেও বেশী দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

এর জুড়ি আদৌ দেখেছি কিনা সন্দেহ।

অথচ সতীদি ঠাকুর্দার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট ছিলেন। আর সেটা দেখলেই বোঝা যেত। আমরা যখন দেখেছি ঠাকুর্দা বুড়োই, কিন্তু সতীদি তখনও যেন যৌবন অতিক্রম করেন নি, এমন স্বাস্থ্য। এত পরিশ্রম করতেন তবু চামড়ায় কোথাও কোঁচ পড়েনি, হাতের শিরা ওঠে নি। হাতের মুঠো খুললে মনে হ'ত ত্নহাতে আলতা মেখেছেন কিছুক্ষণ আগে। 'বাইশ বছরের ছোট আমার চেয়ে'—ঠাকুর্দা নিজেই বলতেন, 'নাতির বয়সে পুতি যাকে বলে।...আমাদের যখন বে হয় তখন আমার ছত্রিশ, ওর চোদ্দ। ভাগ্যিস ছেলেমেয়ে হয় নি নইলে ওকে মা আমাকে দাদু বলত।'

বিয়েটা দ্বিতীয়পক্ষে না তৃতীয়পক্ষের—কেউ ভয়ে ভয়ে জিগ্যেস করলে হা-হা ক'রে হেসে উঠতেন ঠাকুর্দা। বলতেন, 'দ্বিতীয়পক্ষ? কী পেয়েছিস আমাকে? এই চেহারায় বার বার বর সাজব? প্রেথম পক্ষই করবার সাহস হয় নি,—নিতান্ত ইনি নিজের নামের সঙ্গে মেলাতে বুড়োর 'লব্'-এ পড়লেন তাই।...আর বলিস কেন, এঁচোড়ে-পাকা মেয়ে, বাপের বয়িসী ব্রেষকাঠ একটা লোককে কায়দা ক'রে বে করলেন। ভাবলেন উনি বুঝি খুব টেক্কা মারলেন।...মর্ এখন, যেমন বোকা তেমনি ভোগ। বলিছিলুম, রোস, ভাল বে দিচ্ছি তোর। তা নয় জীবনভোর খেটে খেটে গতরপাত, না কোনদিন একটি গয়না অঙ্গে উঠল না একখানা ভাল শাড়ি—এই গুণের ভাতার পেয়েছেন।...তাও বলে কি জানিস? বলে, নিত্যি বিশ্বনাথকে ডাকি, যেন আমার কোলে তুমি যাও!...বোঝো ব্যাপার! হিঁদুর মেয়ে, বামুনের মেয়ে—কোথায় ভগবানকে ডাকবে

যেন সোয়ামীর কোলে মাথা রেখে শাঁখা-সিঁদুর নিয়ে ড্যাং ড্যাং ক'রে যেতে পারি—তা নয়। ওঁর ভয় উনি মরার পর আমি যদি আবার এমনি ছুকৃরি দেখে আর একটা বে করি!'

বলে আবারও হা-হা ক'রে হেসে উঠতেন।

এর বেশী কিছু জানা যেত না।

প্রশ্ন করলেও এড়িয়ে যেতেন।

এই—ওঁর ভাষায় 'লব্'—প্রেমে পড়ার ইতিহাসটা অনেকেই জানতে চেয়েছে, কিন্তু তার অবসর হয় নি। ভেতর থেকে তেড়ে উঠেছেন সতীদি, 'ও কি হচ্ছে কী? বুড়ো না হ'তেই ভীমরতি! বলি, আমি কি তোমার জ্বালায় মাথামুড় খুঁড়ে মরব?'

'আচ্ছা, আচ্ছা। এই চুপ করলুম' বলে থেমে যেতেন একটু, তার পর গলাটা নামিয়ে শ্রোতাদের দিকে চেয়ে চোখ মটকে বলতেন, 'এখনও নাকি আমি বুড়ো হই নি—ভীমরতির বয়স হয় নি। এতেই বোঝ লব্টা কী পরিমাণ প্রেগাঢ়! সতী নাম রাখা ওর বাপ-মার সাথক্—কী বলিস? য়্যাঁ?"

॥ ২ ॥

ওঁরা কোথায় থাকতেন? বলছি। সেই সূত্রেই তো আলাপ।

পাড়াটা বলব না, কারণ এখনও কেউ কেউ বেঁচে আছেন—ও-বাড়ির, ও-পাড়ার। তখনকার যারা নাটকের কুশীলব তাদের ছেলেমেয়েরা স্ত্রীরা তো বটেই। তবে খুবই পরিচিত রাস্তা, গোধুলিয়ার কাছেই।

বাঙালীর বাড়ি। মধ্যে বাগান, চারদিক ঘিরে চকমেলানোর ভঙ্গীতে টানা বাড়ি। মাঝে মাঝে পার্টিশান। এইভাবে মোট ছখানা বাড়ি গুনতিতে। চারদিক ভুল বলেছি, একদিকে এক হিন্দুস্থানী ভদ্রলোকের বাড়ি ছিল, বাগানের দিকে তার পিছনটা। সব বাড়িই তিনতলা, তলায়

তলায় ভাড়াটে, আধুনিককালের ফ্ল্যাটের মতো। সেইভাবেই তৈরী। মাঝখান দিয়ে সিঁড়ি, সিঁড়ির মুখের দরজা বন্ধ করলেই—একানে, আলাদা।

দোতলা তেতলায় ঐ হিসেবে ভাড়া, এক এক ফ্ল্যাটে এক এক ঘর ভাড়াটে—কিন্তু একতলায় নয়। রাস্তার দিকে যে দুটো বাড়ি, তার একতলার ঘর, দোকান ঘরের হিসেবে করা, তখন দোকান হয় নি—মেথর কসাই টিকেওলা প্রভৃতি শ্রেণীর হিন্দুস্থানী ভাড়াটে কয়েক ঘর ছিল। তারা কোথাকার কল-পাইখানা ব্যবহার করত তা জানি না, তবে বাড়ির ভেতরের সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল না।

বাকী যা ভেতরের ঘর—সে ভালো ভাড়াটে পাবার মতো নয়। এক-তলার ঘর কাশীর বাড়িতে—গরমের দিন ছাড়া ব্যবহার করা যায় না।

অবশ্য এ বাড়িগুলো ঠিক বাঙালীটোলার বাড়ির মতো নয়—মধ্যে বাগানটা থাকায় অত স্যাঁৎসেঁতে অসূর্যম্পশ্যা হ'তে পারে নি—তবুও একদিকেই দরজা জানলা—তিনদিক চাপা বলে বাস করা বেশ কষ্টসাধ্যই ছিল।

তাই, যাদের কষ্ট ক'রে থাকা ছাড়া উপায় নেই—খোপে খোপে পায়রার মতো, সেই বুড়িরাই ভাড়া থাকত।

কাশীর বিখ্যাত সেই হতভাগ্য স্বজনপরিত্যক্ত বুড়ির দল—এক এক-খানি জীবন্ত সচল উপন্যাস—এখন যে 'রেস' নিশ্চিহ্ন হয়ে আসছে!

এক চিল্‌তে ক'রে খুপরি ঘরে থাকত, সামনের রকটুকুতে রান্না করত, বাসন মাজত, জল রাখত—কখনও কখনও স্নানও সারত। সেই রকেই কেউ কেউ কাকের ভয়ে চট ঝুলিয়ে নিয়েছিল। যার তাও জোটেনি, তোলা উনুন ধরিয়ে নিয়ে গিয়ে ঐ ঘরেরই এক পাশে রান্না করত। রান্না অবশ্য একবেলা, তাও মাসে অন্তত সাত-আটদিন বাদ। তবু আয়োজন সবই রাখতে হ'ত। ঐ ঘরটুকুর মধ্যেই হয়ত একটা কেরোসিনের টিন কি

কাঠের বাক্সতে কয়লা, চুপড়িতে ঘুঁটে রাখতে হত—হাঁড়িতে হাঁড়িতে চাল, ডাল, আটা, গুড়।

তবু এ-বাড়ির ঘর ভাল এবং বাঙালীটোলার মধ্যে নয় বলে ভাড়া একটু বেশীই ছিল, মাসিক আট আনার কমে কোন ঘর ছিল না।

সুতরাং এখানে যারা বাস করত তাদের আয়ও ভাল। মাসিক তিন টাকা আয়ে যাদের সংসার চালাতে হ'ত—তখনকার দিনেও তাদের বাঙালীটোলার অন্ধকূপ নিচের ঘর ছাড়া গতি ছিল না। এ-বাড়িতে যাঁরা থাকতেন তাঁদের কারুর মাসে ছয় কারুর বা আট টাকা মাসোহারা আসত। গোসাঁই গিন্নী আর তারা দিদিমা পুরো দশ টাকারও বেশি পেতেন। তাঁদের ঘরও ভাল ছিল। এক টাকা ক'রে ভাড়া দিতেন তাঁরা।

এরই একখানাতে—গোসাঁই গিন্নীর পাশের ঘরে থাকতেন রমেশ ঠাকুর্দারা।

ভাড়া দিতে হ'ত না, এমনিই থাকতেন। তার কারণ, বর্তমানে যিনি বাড়িওলা—এঁর একবার খুব মায়ের অনুগ্রহ হয়েছিল। খুব বাড়াবাড়ি, এত ভীবৎস ঘা যে বাপ-মাও ঘরে ঢুকতে পারতেন না। গা কাঁপত তাঁদের, মাথা ঘুরে যেত।

সেই সময় ঠাকুর্দা লোক মুখে শুনে উপযাচক হয়ে এসে খুব সেবা করেন। মানপাতা যোগাড় ক'রে তাতে মাখন মাখিয়ে শুইয়ে রাখা, দিনরাত মশারির মধ্যে ধুনো দিয়ে, শুকোবার ব্যবস্থা করা, ঘড়ি ধরে পথ্য খাওয়ানো,—খাওয়ার অবস্থা ছিল না, ফোঁটা ফোঁটা ক'রে এক ঘণ্টা ধরে দুধ খাওয়াতে হ'ত—সব একা করেছেন। বাড়িওলার একমাত্র ছেলে, তাঁরা প্রচুর পুরস্কার দিতে গিয়েছিলেন, ঠাকুর্দা নেন নি।

সে কথা বর্তমান বাড়িওলা লক্ষ্মীবাবু ভোলেন নি। তিনি সসম্মানে একটা গোটা ফ্ল্যাট ছেড়ে দিয়ে ওঁদের এনে রাখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাতেও রাজী হন নি রমেশ ঠাকুর্দা। বলেছিলেন, 'এখন তো ঝোঁকের

মাথায় কাজটা করবে ভায়া—শেষে আপসোসের সীমা থাকবে না। তখন তাড়াতেও পারবে না, আমাদের ওপর বিষদৃষ্টি পড়বে। ও কাজে আমি নেই, আমি যেমন মানুষ, যে ঘরে থাকার যুগ্যি—ঐ নিচের তলার একখানা ঘর যদি দাও, তবেই আসব—নইলে এখান থেকেই রাম রাম !'

তাই দিয়েছিলেন লক্ষ্মীবাবু। অবশ্য ওরই মধ্যে যেটা একটু বড়—সেইটেই দিয়েছিলেন।

সেই থেকেই এখানে আছেন ঠাকুর্দা। বাগানটার জন্যেই ঘরটা বড় প্রিয় ছিল তাঁর, পাড়াগাঁয়ের মানুষ একটু গাছপালা না দেখলে প্রাণটা হাঁপিয়ে উঠত। বাগান তো ভারী, দু-তিন ঝাড় কাঁচকলা, গোটাকতক পেয়ারা গাছ, একটা ডালিম আর একটা একপেটে টগর। তবু ঐটুকুই ওঁর প্রাণ ছিল। নিজে হাতে তদ্বির করতেন, নিঃস্বার্থভাবে। তবে, দীর্ঘকাল ওখানে কাটালেও, বেচারা শেষ নিঃশ্বাসটা ওখানে ফেলতে পারেন নি।

কিন্তু সে কথায় পরে আসব।

ঐ ব্যারাকবাড়িরই রাস্তার দিকে যে দুটো অংশ—তারই একটার তিনতলায় থাকতুম আমরা।

রান্না-ভাঁড়ার ছিল চারতলায়, সেখানে জল যেত না। নিচে থেকে জল বইতে হ'ত। ভাড়াও অনেক বেশী, মানে কাশীর হিসেবে, বারো টাকা। তবু, বাড়িটা ভাল ছিল বলেই—তখনকার দিনে কাশী শহরে অত ফাঁকা বাড়ি দুর্লভ—অনেক অসুবিধা সহ্য ক'রেও থাকতুম আমরা।

আমাদের তিনতলার বারান্দা ছিল খুব প্রশস্ত, বারো ফুট চওড়া হবে বোধহয়। তারই এক কোণে রাস্তার দিকে মার তুলসীগাছের টব থাকত।

তিনতলার বারান্দা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ আছে, দোতলার বারান্দাটা—কী কারণে জানি না দু-ভাগে ভাগ করা ছিল। রাস্তার দিকের অংশটা তিনটে ধাপ ভেঙ্গে ওপরে উঠতে হত, ফলে নিচের ঘর-

গুলোয় অত আলো-বাতাস যেত না।

যাক—যা বলছিলাম, মার ঐ তুলসীগাছ উপলক্ষ ক'রেই ঠাকুর্দার সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয়। আর, এই ঘটনাটা ওঁর স্বভাবেরও একটা পরিচয় বটে।

তখনও আলাপের কোন সূত্র পাওয়া যায় নি, অর্থাৎ কোন যোগা-যোগ ঘটে নি।

আমরা ওঁদের দেখি ওপরের জানলা থেকে, বুড়ো ভোরে উঠে অবিরাম খক খক করে কাশেন আর ভুড়ুক ভুড়ুক ক'রে তামাক টেনে যান। সতীদি ওঁরও আগে ওঠেন, খুটখাট ঘরদোরের কাজ করেন, মধ্যে মধ্যে কর্তাকে তামাক সেজে দেন আর পাশের বারান্দায় গোসাঁই গিন্নির একটা পোষা চন্দনা ঝোলানো থাকত তাকে চাপাগলায় পড়ান, 'পড়ো বাবা আত্মারাম, পড়ো। বলো, হরে-কৃষ্ণ, হরে-কৃষ্ণ। বলো বাবা বলো।' চাপাগলায় কারণ—ঠিক মাথার ওপরেই প্রয়াগবাবুরা থাকতেন। তাঁরা বেলায় ঘুম থেকে ওঠেন—চেঁচিয়ে পাখী পড়ালে তাঁরা বিরক্ত হবেন।

এই পর্যন্ত।

উনি বা ওঁরা যে আমাদের লক্ষ্য করেছেন—বা আমাদের অস্তিত্ব আদৌ অবগত আছেন—তাও জানি না।

হঠাৎ একদিন আমাদের সিঁড়িতে চটাস চটাস চটির শব্দ। ঠনঠনের চটি পায়ে দিতেন ঠাকুর্দা। ওঁর ঐ বিশেষ জুতো সম্বন্ধে আসক্তি জেনে কেউ-না কেউ এনেই দিত কলকাতা গেলে। তখন আঠারো আনার চটি বুকে-হাঁটু দিয়ে পুরো দুটি বছর চলত!—

যাই হোক অত তখনও জানি না, আমাদের সিঁড়িতে কে উঠতে পারে ভেবে পেলুম না! আমাদের এখানে তিনতলায় কস্মিনকালে কেউ ওঠে না, আমরা নতুন লোক—এখানে আমাদের পরিচিত বলতে যা দু-এক জন—তারা সকলেই দূরে দূরে থাকে—একজন পাঁড়ে-হাউলী, একজন

চৌখাম্বা। এত সকালে তারা কেনই বা আসবে? কিছুই ভেবে না পেয়ে অবাক হয়ে, আমি মার মুখের দিকে—মা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলুম।

একটু পরেই খট খট ক'রে কড়া নড়ে উঠল। আমাদেরই দরজার কড়া। একটু ভয়ে ভয়েই দরজা খুলে উঁকি মেরে দেখি—রমেশ ঠাকুর্দা। তখন 'নিচের ঐ বুড়োটা' বলে উল্লেখ করতুম ওঁকে।

উনি কিন্তু আমাদের দিকে চেয়েও দেখলেন না, বা এই আকস্মিক আগমনের জন্যে কোন কৈফিয়ৎ দেওয়াও প্রয়োজন মনে করলেন না।

'সর্ সর্' বলে আমাকে এক রকম ঠেলেই সরিয়ে—দরজার বাইরে চটিটা ছেড়ে, গট্ গট্ ক'রে চলে গেলেন লম্বা বারান্দা পেরিয়ে একেবারে পুব-দক্ষিণ কোণে—তুলসীগাছটার কাছে। তারপর উবু হয়ে বসে আঙ্গুলে পৈতে জড়িয়ে কী একটা মন্ত্র পড়ে নিয়ে—হয়ত প্রণাম-মন্ত্রই হবে—তুলসীর মঞ্জরীগুলো ভাঙ্গতে লাগলেন। একমনে, নিবিষ্ট হয়ে।

আমাদের গাছ, এতে যে আমাদের কোন বক্তব্য থাকতে পারে, বা আমাদের অনুমতি নেওয়া বা অন্ততঃ ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলা যে দরকার—তাও ওঁর মাথায় এল না।

একেবারে সব মঞ্জরীগুলো ছেঁড়া হ'লে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর সেই কুৎকুতে চোখে পিট পিট করে তাকিয়ে একটা প্রায়-হুঙ্কার ছাড়লেন, 'হ্যা……! গাছ পুঁতলেই হয় না, তুলসীগাছ পুঁতলুম আর একটু ক'রে জল দিলুম, ব্যস্ হয়ে গেল, ডিউটি শেষ! অত মঞ্জুরী হয়েছে—গাছ বাঁচে কখনও? মরে যাবে যে! আমি তাই রাস্তা থেকে দেখি, ভাবি, এই আজ ছিঁড়বে—কাল ছিঁড়বে—দেখি কিছুই কেউ করে না। বুঝলুম কথাটা মাথাতেই ঢোকে নি, কল্‌কাতার ভূত তো, গাছের মর্ম কিছু জানে না, ও আমাকেই করতেই হবে।'

এই বলে হে-হে ক'রে হাসলেন খানিকটা। তারপর আমার মাকে

সম্বোধন ক'রে বললেন, 'তোমার উনুনে আঁচ পড়েছে—বৌমা ?'

মা নতমুখে জবাব দিলেন, 'না, এই তো বাসিপাট সারা হ'ল। এইবার দেব।'

'কী সর্বনাশ! এখনও আঁচ দাওনি, সাতটা বেজে গেল! কখন আঁচ উঠবে আর কখন রান্না করবে!…ছেলেরা ইস্কুলে খেয়ে যাবে তো! …উনুন ধরানো কি চাট্টিখানি কথা, ভারী শক্ত কাজ।…ঐটেই তো আসল। উনুন যদি ধরে গেল, গনগনে আঁচ উঠল, রান্না করতে কতক্ষণ? …যাও, যাও, আর দাঁড়িয়ে থেকো না, যাও!'

আবার তিনি চটি পায়ে গলিয়ে চটাস্ চটাস্ শব্দ ক'রে নেমে গেলেন, কলকাতার লোকেদের গ্রাম্যতা আর অজ্ঞতা সম্বন্ধে আপনমনেই মন্তব্য করতে করতে।

পরে জেনেছিলাম—উনি আমাদের সতীদিদির সংসারে ঐ একটি কাজ ক'রে দিতেন, সকালে কাজে বেরোবার আগে উনুনটা ধরিয়ে দিয়ে যেতেন।

উনুন সাজিয়ে নিচে থেকে একটি লম্প বা ডিবে জেলে দিতেন একটু অপেক্ষা করে ঘুঁটে ধরে উঠেছে বুঝলে সেটা নিভিয়ে দিয়ে চলে যেতেন।

সেই সময়টা সতীদির বাসিপাট সেরে স্নান করতে যাবার সময়। একটি মাত্র কল, নিচের এতগুলি ভাড়াটের জন্যে—ওদের বাদ দিয়েও জনা-ছয়েক, আর বুড়োমানুষদের কলতলায় একটু বেশীক্ষণই লাগে—সুতরাং ইচ্ছামাত্র স্নান সেরে চলে আসা যেত না। গোসাঁইদিদির ভাষায় 'টর্ন' আসার জন্যে অপেক্ষা করতে হ'ত।

আগে কলতলাটা খোলা জায়গায় ছিল, বালতি ক'রে জল বয়ে এনে নিজেদের রকে চটের আড়ালে চান সারতে হ'ত, কতকটা সতীদির জন্যেই এখন দুপাশে আর মাথায় করগেটের টিন দিয়ে একটু আড়াল-মতো হয়েছে, বাথরুমের নামান্তর। ঠাকুর্দা প্রত্যহ বারোটা নাগাদ তাঁর

কয়লার ক্যাশ বন্ধ ক'রে ফটকে তালা লাগিয়ে গঙ্গাস্নান ক'রে ফিরতেন—কলঘর লাগত না।

তা, ঐ একটি কাজ করতেন বলেই ঠাকুর্দার ধারণা ছিল—সংসারের কঠিনতম কাজ হল উনুনে আঁচ দেওয়া।

॥ ৩ ॥

বাড়িভাড়া লাগত না ঠিকই—তবু পাঁচ টাকায় দুজন লোকের তখনও চলত না। শুধু খাওয়াটা হয়ত চলে যেতে পারত, সব খরচ জড়িয়ে চলা সম্ভব নয়—তা যত সস্তাগণ্ডাই হোক।

অথচ সঙ্গতিও আর ছিল না।

ঠাকুর্দামশাই আমাদের নাকি কখনই কিছু করেন নি, যাকে কিছু 'করা' বলে—চাকরি-বাকরি কি ব্যবসা-পত্র।

তার কারণ—যাতে এ বাজারে ক'রে খাওয়া যায়—উনি সেই ইংরেজী লেখা-পড়া কিছুই জানতেন না জানার ইচ্ছে ছিল, সুযোগ হয় নি।

চব্বিশ পরগণার রাজপুর-হরিনাভি অঞ্চলে কোন্ এক পল্লীগ্রামে বাড়ি, পুরুত-বামুনের ছেলে উনি।

গ্রাম্য পুরোহিত, উপার্জন কম, অনেক ছেলেমেয়ে। ইংরেজী লেখা-পড়া শিখিয়ে পাস করাবেন, সে সঙ্গতিও ছিল না, ইচ্ছাও ছিল না। তখন পাঠশালা ছিল গ্রামে গ্রামে। পাঠশালায় পড়ার পর বাবা টোলে দিয়েছিলেন হরিনাভিতে—সংস্কৃত পড়তে।

সে পড়া ভাল লাগে নি, লাগেনি নি বোধহয় বাবার উদ্দেশ্য বুঝেই আরও। বাবা সংস্কৃতটাও কোন উপাধি পাবার জন্যে পড়তে দেন নি। অল্প কাজ-চলা-গোছ শেখার পর যজমানী করবে ছেলে—এইটেই চেয়েছিলেন।

ঠাকুর্দা টোলে পড়তে পড়তেই ইংরেজী শেখার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তখন পাড়াগাঁয়ে ইংরেজী শেখাবার লোক বিশেষ ছিল না। মাস্টারদের কাছে পড়তে গেলে মাইনে লাগে—পাড়ার ছোট ছেলেদের ধরে শেখা সুতরাং অক্ষর পরিচয় আর 'আই গো' 'ইউ গো' 'হি গোজ'—এর বেশী এগোয় নি।

পরে নাকি এখানে এসে একখানা 'রাজভাষা' বই কিনে অনেক ইংরেজী শব্দ শিখেছেন, তবে তাকে ইংরেজী শেখা বলা যায় না কিছুতেই।

কাশীতে এসে বেশ কিছুদিন টিউশ্যনী ক'রে চালিয়েছিলেন।

তখন এখানে বাঙালীর ছেলের বাংলা পড়বার ইস্কুল ছিল না বিশেষ। অনেকেই তাই প্রাইভেটে পড়াতেন।

রমেশ ঠাকুর্দা বাংলা আর সংস্কৃতও একটু—মোটামুটি কাজ চলা গোছের জানতেন বলে কোন অসুবিধে হয় নি। এক টাকা আট আনা মাইনের টিউশ্যনি, এ-ই বেশির ভাগ। একসঙ্গে দুভাইকে পড়িয়েছেন মাসিক বারো আনায়—এ টিউশ্যনীও করেছেন।

তাতেই তখনকার দিনে বেশ আয় হত—মাসে ছ'-সাত টাকা হেসে-খেলে। গোপাল মন্দিরে থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল বিনা-ভাড়ায়, আর এক বামুনবাড়ি মাসে তিন টাকা দিয়ে দুবেলা খাওয়া চলত। পরে বিয়ে করার পর ঘর ভাড়া ক'রে সংসার পাততে হয়েছে—তেমনি তখন একটু বেশী খেটে মাসে দশ টাকা পর্যন্ত উপার্জন করেছেন।

তবে কখনই কিছু জমান নি, গুধুড়ি বাজার ঘুরে পুরনো বই কেনার বাতিক ছিল। অবশ্য সে আর কতই বা—দু পয়সা চার পয়সা—আর ছিল কিছু গোপন দানধর্ম। সতীদি ঠাট্টা ক'রে বলতেন,—'মেগে পাই বিলিয়ে খাই', তবে কোনদিন বাধাও দেন নি। স্বামীর কোন কাজেই কোনদিন বাধা দেন নি বা অসন্তোষ প্রকাশ করেন নি। তাঁর বিবাহ-ক্ষণের প্রথম প্রণয়-বিহ্বলতা সারা জীবনে কাটে নি।

কিন্তু তার পর—দিন পাল্টে গেল।

ওঁরও বয়স হয়ে গেল, বাংলা পড়াবার মতো ইস্কুলও হয়ে গেল একাধিক।

প্রাইমারী বা পাঠশালা তো পাড়ায় পাড়ায়।

'ঐ চিন্তামণি যখন সরকারী চাকরি ছেড়ে এসে য়্যাংলোবেঙ্গলী ইস্কুল করব বললে—আমিও তখন ওর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে পথে পথে ভিক্ষে করেছি। নিজের ভাত-ভিক্ষে যাবে বলে জাতের ক্ষেতি করব—সে শিক্ষা আমার নয়।'

হেসেই বলতেন ঠাকুর্দা, শুধু হাসিটা ঈষৎ করুণ লাগত।

আরও মুশকিল হ'ল উনি ইংরেজী পড়াতে পারেন না, ইস্কুলে দিলে একসঙ্গে সবই হয়। ওঁকে মাইনে দিয়ে রাখবে কেন বাপ-মারা? একটি একটি ক'রে ছাত্রসংখ্যা কমতে কমতে একটিও রইল না আর। তখন—যাকে বলে 'চোখে অন্ধকার দেখা' তাই দেখলেন।

এই আয় কমবার মুখেই, টিউশ্যনী কমতে কমতে যখন মাসিক চার-পাঁচ টাকা আয়ে পৌচেছে—বোধহয় লোকমুখে বিপন্ন শুনেই—লক্ষ্মীবাবু এখানে ঘর দিয়ে এনে রেখেছিলেন। তবে তাতেই বা কি হয়? শেষে এমন অবস্থা হ'ল—মুখুয্যেমশাই এক ছত্তরে গিয়ে খেতে শুরু করলেন, সতীদি দিনের পর দিন একমুঠো ক'রে চিঁড়ে খেয়ে কাটাতে লাগলেন।

তারপরই কী একটা যোগাযোগে পাইনদের দোকানে এই কাজটা পেয়ে গিছলেন।

ওঁকে এখানে ততদিনে অনেকেই চিনেছিল। গরিব লোক, কিন্তু কারও সাহায্যপ্রার্থী কি ভিক্ষার্থী নয়, বরং পরোপকারী, সৎ ব্রাহ্মণ—এই জন্যেই সকলে ভালবাসত, শ্রদ্ধা করত। ভবানীদাও জানতেন ওঁকে, তাঁরও লোকের দরকার একজন—কিন্তু ব্রাহ্মণ তাঁদের কাছে কাজ নেবেন কিনা, সন্দেহ ছিল। ঠিক ভরসা ক'রে জিজ্ঞাসাও করতে পারেন নি।

ঠাকুর্দা যা মুখফোঁড় লোক, হয়ত মুখের ওপরই বলে বসবেন, 'তোমার আস্পদ্দা তো কম নয় দেখি! তুমি চাও বামুনের ছেলেকে চাকর রাখতে!...না হয় গরিবই হয়েছি, তাই বলে পথে পথে ভিক্ষে তো শুরু করি নি এখনও!...আর বামুনের ছেলে ভিক্ষে করলেও তো দোষ হয় না, তাই বলে বেনের কাছে চাকরি! বলি এখনও তো চন্দ্র স্যিয্যি উঠছে, না উঠছে না?...যদ্দিন তা উঠবে ভগবানের রাজত্বে বামুন বামুনই থাকবে।'

এই ভয়েই অনেকদিন চুপ ক'রে ছিলেন।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল সে ভয় অমূলক। ভবানীদা একদিন নন্দ লাহিড়ীকে কথাটা বলেছিলেন—নন্দ লাহিড়ীও অনেক ইতস্ততঃ ক'রে—বেশ একটু ভয়ে ভয়েই পেড়েছিলেন এ প্রস্তাবটা।

রমেশ ঠাকুর্দা কিন্তু আদৌ চটে ওঠেন নি। বলেছিলেন, 'ও মা, তা করব না কেন? কাজটা পেলে তো বেঁচে যাই ভাই! এতে আবার এত 'কিন্তু' হবার কি আছে?...ন্যাখ্ নন্দ—পষ্ট কথা বলছি, আজ যে আমার অভাব বলে তা নয়, বামুনের ছেলে গঙ্গার ধারে বসে ভিক্ষে ক'রে খেলেও বামুনই থাকব, কেউ বামুন বই শুদ্দুর বলবে না—তা নয়, এ জাতের ভণ্ডামিতে আমার অরুচি ধরে গেছে অনেকদিন।'

একটু থেমে দম নিয়ে আবার বলেছিলেন, 'অনেক বামুন দেখেছি, অনেক দেখছি—তাদের কাছে চাকরি করা তো দূরের কথা তারা সিধে কি বিদেয় দিতে এলেও নোব না। তাদের কাছে ভবানী লাখো গুণে সোনা। ব্যবসা করতে বসে দুটো মিছে কথা বলে কি ওজনে ঠকায়—আমি জানি না, কথার কথা বলছি—সে আলাদা কথা, সে তবু বুঝি। মিছে কথা কে না বলে, দেহধারণ করলে বলতেই হবে, যুধিষ্ঠিরকে বলতে হয় নি? কেষ্ট বড়াই করেছিল কুরুক্ষেত্তরে অস্তর ধরব না, তাও ধরতে হয়েছে। কিন্তু মাথায় টিকি, গলায় পৈতে, অমুকের হাতে খাব না,

অমুকের বাড়ি পা ধোব না, অথচ এক একটি অর্থপিশাচ সব, কেউ গয়না বন্ধক রেখেও চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ নিচ্ছে, কেউ বা জ্ঞাতিদের কেমন ক'রে বঞ্চিত করবে—সন্ধ্যে করতে বসেও সেই মতলব ভাঁজছে! নয়ত গরিব যজমানকে কি ক'রে দুটো ফাঁকিবাজী কথা বলে দেঁড়েমুষে আদায় করবে—এই চিন্তা অষ্টপ্রহর। আর না হ'লে ঘরে বসে বিধবা ভাজের পেট খসাচ্ছে।...হাত্তোর বামুন। কলির বামুন আবার বামুন কি রে? কলিতে বামুন শুদ্দুরের দাসত্ব করবে—এ তো শাস্তরের বিধান!'

সেই থেকেই ওখানে চাকরি করছেন ঠাকুর্দা।

ভবানীদা তো বেঁচে গেছেন বললেই হয়। কারণ এটা সবাই জানে, না খেয়ে মরে গেলেও রমেশ মুখুজ্যে এক পয়সা ভাঙবে না, কি কোন তঞ্চকতা করবে না।

ভবানীদা উনি আসবার পর দোকানে বসাই ছেড়ে দিয়েছেন এক-রকম, এক আধবার আসেন, খোঁজখবর নেন, মাল কেনার দরকার আছে কিনা জিজ্ঞাসা করেন, টাকাটা হিসেব বুঝে গুনে নিয়ে চলে যান। ভবানীদার ব্যবসার দিকে ঝোঁকটাই কমে আসছিল, পরে ঠাকুর্দার যখন আর মোটেই খাটবার অবস্থা রইল না—তখন দোকানই তুলে দিলেন। শুনেছি তারপর সন্ন্যিসী হয়ে গেছেন ভবানীদা।

সে যা-ই হোক—ভবানীদারও এমন অবস্থা নয় যে ওর থেকে বেশী মাইনে দেন। একটা চাকর রাখতে হয়েছিল, এটা ওটা খুচরো খরচও তো আছে। বিক্রী তো ঐ, দু'ওয়াগন কয়লাও এক মাসে কাটত না। কিন্তু ঠাকুর্দারও অন্য কাজ খোঁজবার কি করবার অবস্থা নয়।

তবে চলে কিসে?

এই প্রশ্নটাই আমাদের মনে বার বার দেখা দিত।

সে উত্তরটা দিয়েছিলেন আমার মা—কিছুদিন লক্ষ্য ক'রে দেখবার পর।

সতীদিকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি জবাব দিতেন, 'যোগেযাগে চলে যায় মা, বাবা বিশ্বনাথের রাজত্বে পড়ে আছি, তিনিই চালিয়ে দেন। নইলে বাবার নাম যে মিথ্যে হয়ে যাবে, তাঁকে লজ্জায় পড়তে হবে।'

মাও তাই বলতেন, 'সত্যিই যোগেযাগে চালায় বামনী। কি ক'রে যে চালায় তা ও-ই জানে। বুড়োর কপাল ভাল তাই অমন বৌ পেয়েছে। শুধু রূপ নয়—রূপ তো অনেকেরই আছে, আগুনের মতো রূপ দেখেছি, যেখানে যায় আগুন ধরায়—এমন গুণ কোথায় পাবে? সর্বংসহা একেবারে, ধরিত্রীর মতো। ঐ তো ছিরির বর, তার জন্যে কী সহ্যই না করছে!'

আমরাও তারপর দেখেছিলুম লক্ষ্য ক'রে—মার কথামতো।

কী না করেন ভদ্রমহিলা!

তখন ছোটখাটো যজ্ঞিতে হালুইকর ডাকত না কেউ—কাশীতে বিশেষ পাওয়াও যেত না। 'হাল্‌ওয়াই'—অর্থাৎ ওদেশী কচুরি লাড্ডু করবার কারিগর মিলত, কিন্তু বাঙ্গালী যজ্ঞির লোক বিশেষ ছিল না।

সুতরাং কারও বাড়ি যজ্ঞি হ'লে মেয়েরাই মিলেমিশে কাজটা তুলে দিতেন; অবশ্য ছোটখাটো যজ্ঞি, ত্রিশ-চল্লিশ কি পঞ্চাশ জন বড়জোর, তার বেশী হলে লোক ডাকতেই হত। হিন্দুস্থানী হালুইকরই ডাকা হ'ত—কারণ কাশীতে তখন খুব বেশী যজ্ঞিতে মাছ মাংস হ'ত না। বিয়ে কি অন্নপ্রাশনেই মাছ হ'ত যা—তাও অল্প লোকের ব্যাপার হ'লে মেয়েরাই সেরে নিতেন।

এইসব ক্রিয়াকর্মের বাড়িতে সতীদি গিয়ে বুক দিয়ে পড়তেন, বলারও অপেক্ষা করতেন না।

ছোটখাটো ভোজের ব্যাপার যেখানে—সেখানে সব রান্না একাই তুলে দিতেন প্রায়, যেখানে দু'-আড়াইশ'র ব্যাপার সেখানেও কুটনো কোটা যোগাড় দেওয়ার প্রশ্ন আছে, ওঁর কাজের অভাব হ'ত না।

অন্নপূর্ণা পূজো, কার্ত্তিক পূজো, জগদ্ধাত্রী পূজো—এ সবেতে ভোগ রঁাধার ভার পড়ত তাঁর ওপর। নিরম্বু উপোসী থেকে অত শুদ্ধাচারে আর কে করবে ?

তবে একটি শর্ত ছিল ওঁর। উনি না খেয়ে সারাদিন খাটতে রাজী ছিলেন, খাটতেনও তাই, খেলে খাটতে পারা যায় না—এই কারণ দেখিয়ে বড়জোর একটু শরবৎ কি একটু দই খেয়ে নিতেন একবার, ভোগ রঁাধার কাজ থাকলে তো চুকেই গেল—কিন্তু বেলা বারোটার সময় বুড়োর খাবারটি ঘরে পৌছে যাওয়া চাই।

পরিষ্কারই বলতেন, 'উনি আমাদের' কিম্বা 'তোমাদের মুখুজ্যেমশাই' ক্ষিদে একেবারে সহ্য করতেপারেন না। বারোটা বাজলেই ছটফট করেন, একেবারে ছেলেমানুষের বেহদ্দ হয়ে যান।...ঐটি আমার চাই ভাই—ঠাকুরদেবতা যা বলো সব মাথায় আছেন, মাথাতেই থাকুন—আমার সকলের ওপর উনি। ওঁর এই দুপুরের খাবারটি পৌছে দিয়ে আসব, তারপর বলো—সারা দিনরাত পড়ে আছি তোমার এখানে। রাতের খাওয়ার জন্যে অত তাড়া নেই, ঘরে চিঁড়ে আছে মুড়ি আছে—আমার দেরি হয় সে ঠিক জলে ভিজিয়ে একগাল খেয়ে নেবেথন্। দুপুরে কারও কথা শুনবে না!'

আর সে খাবারও—অপরকে দিয়ে পাঠানো চলত না।

মুখুজ্যেমশাই যার-তার হাতে খেতে পারতেন না। স্ত্রীর রান্না ছাড়া তো পছন্দই হ'ত না—সেই জন্যেই আরও, যজ্ঞিবাড়িতে গিয়ে সতীদি রান্নার দিকেই এগিয়ে যেতেন বেশির ভাগ—ঠাকুর্দা কুৎকুতে চোখ একটা টিপে বলতেন, 'যজ্ঞির ভাত, কলার পাত, মায়ের হাত—লোকে কথায় বলে, ঐ শেষের শব্দটা একটু বদলে নিয়েছি, মাগের হাত ক'রে নিয়েছি' বলে হা-হা ক'রে উঠতেন—তাও যদি না হয়, তিনি সামনে ধরে দিলেই খুশী। কে কিভাবে দেবে, কি কাপড়ে আনবে, প্রত্যঙ্গ-বিশেষ চুলকোতে

চুলকোতেই হয়ত সেই হাতে ধরবে, কিম্বা ঘাম পড়বে বা থুথু—এইসব বাছবিছার ছিল খুব বেশী।

সেই কারণেই যত কাজ থাক—নিতান্ত দূরের পথ হ'লে হয়ে উঠত না, ভেলুপুরা কি কেদারঘাট থেকে তো আর আসা যায় না—তবে এই কাছাকাছি রামাপুরা কি লাক্‌সা কি খোদাইচৌকী কি সূর্যকুণ্ড হ'লে ঠিক বুকে ক'রে এনে পৌছে দিয়ে যেতেন এক ফাঁকে। তাতে ফিরে গিয়ে আবার কাপড় কাচতে হয় কি স্নান করতে হয়—কোন আপত্তি নেই।

দূরের পাড়ি হ'লে রাত তিনটেয় উঠে তোলা জলে বাসিপাট সেরে যা হোক একটু ভাতেভাত রেঁধে রেখে যেতেন, মাথার দিব্যি দিয়ে বলে যেতেন খাওয়ার আগে একটু 'ছিপারী' জ্বেলে যেন গরম ক'রে নেন একবার।

কিন্তু এই এত কাণ্ড ক'রে ছুটে যাওয়া—শুধু একবেলা কি দু'বেলা ঠাকুর্দাকে ভালমন্দ লুচি-সন্দেশ-রাবড়ি খাওয়ানোর জন্যেই নয়।

এতে অন্যদিক থেকেও কিছু আমদানী হ'ত।

হয়ত আনাজ-কোনাজ অনেক এসে পড়েছে, দেখা গেল যজ্ঞি শেষ হবার পরও স্তূপাকার হয়ে পড়ে আছে আলু কি কপি কি মটরশুঁটি। স্বভাবতঃই গৃহিণীরা বলতেন, 'কিছু নিয়ে যাও না দিদি (কিম্বা মাসীমা কি বামুন মেয়ে—যেখানে যে সম্পর্ক) এখানে পচবে বৈ তো নয়।'

দিদি দু'একবার 'না না' ক'রে নিয়েও আসতেন। অল্প কিছু গামছায় বেঁধে আনলেও দুজনের সংসারে সাতদিন চলে যেত, তাছাড়া পোড়া ঘি (তখন সৌভাগ্যবশতঃ বনস্পতি বাস্তুদেবতা হয়ে ওঠে নি) হয়ত অনেক বেঁচেছে, মাথাটাথা চুলকে গিন্নী বলে ফেললেন শেষ পর্যন্ত, 'বলতে তো পারি না দিদি, এতটা পোড়া ঘি, অপরাধ নেবেন না, আপনার মতো দেখেন বলেই বলছি—নিয়ে যাবেন একটু? মুখুজ্যেমশাইকে দু'খানা লুচি ভেজে দিতেন ?'

এইভাবেই তেল, মশলা, মায় ফোড়ন পর্যন্ত আসত—বাড়ি-বিশেষ বা স্থান বিশেষে।

বাড়ি বিশেষে এই জন্যে বলছি, তেমন তেমন হিসেবী বাড়িতে বেশী কিছুই বাঁচে না, কমই পড়ে শেষের দিকে। আর স্থান বিশেষ অর্থাৎ—স্বল্প-পরিচিত লোকের বাড়ি, যেখানে অন্য কোন পরিচিত লোকের সুবাদে গেছেন—সেখানে নিতে বললেও দিদি নিতেন না, মিষ্টি কথায় নিরস্ত ক'রে চলে আসতেন।

তবে পাওনা এ-ই সব নয়।

এত যে মানুষটা এসে খাটলেন দুদিন তিনদিন ধরে,—যেখানে যেমন দরকার—মুখের রক্ত তুলে বলতে গেলে, তাকে শুধু উদ্বৃত্ত জিনিস কিছু দিলেই কর্তব্যের শেষ হয় না।

নগদ টাকা অবশ্যই সতীদি নিতেন না—মানে পারিশ্রমিক হিসেবে হাতে হাতে—কিন্তু বিবেচক যে হয় সে দেওয়ারও অনেক উপায় জানে।

সেটা হঠাৎ-বড়মানষীর ঔদ্ধত্য বা আত্ম-বড়মানষীর দিন ছিল না। আমি আমার, সুখের জন্যে বিলাসের জন্য মুঠো মুঠো টাকা খরচ করছি, এক টাকা কাউকে দিতে হ'লেও পকেট থেকে নোটের গাদা হাজার দেড় হাজার টাকা বার করছি, কিন্তু পাণ্ডা এলে তাকে তেড়ে মারতে আসছি, মুটেকে দুপয়সা কম দেবার জন্যে লম্বা বক্তৃতা করছি—এখন এই লোকই বেশী। এরা দান করে—যদি বা করে—তাচ্ছিল্যের সঙ্গে। সে দান নিরুপায় লোকেরও নিতে মাথা কাটা যায়।

তখনকার দিনে লোকে দানও করত অতি সন্তর্পণে, বিনয়ের সঙ্গে। এর ব্যতিক্রমও হয়ত ছিল, তবে আমি ছেলেবেলায় যে কাশী দেখেছি—সেই কাশীর কথাই বলছি।

কাজকর্ম চুকে গেলে হয় বাড়ির কোন ছেলেকে দিয়ে (অব্রাহ্মণের ক্ষেত্রে কোন ব্রাহ্মণ সঙ্গে দিয়ে) অথবা কোন ব্রাহ্মণের মেয়েকে দিয়ে

একটি বড় ক'রে সিধা পাঠানো হ'ত, তার সঙ্গে সন্দেশ আলতা সিঁদুর— নতুন কাপড়। ফলে বিস্তর শাড়িকাপড় জমে যেত সতীদির। মুখুজ্যেমশাই বাড়িতে শাড়ি পরেই কাটাতেন, তা ছাড়াও অনেক সময় সতীদি দশাশ্বমেধের কোন চেনা দোকানে, কি এই বাড়ির অন্য ভাড়াটে কাউকে দিয়ে তার বদলে ধুতি নিতেন।

এই সিধার সঙ্গে সিকি-আধুলি বা কোন কোন জায়গায়—তবে সে খুব কমই—টাকাও আসত দক্ষিণা। সিধাতেও, সাধারণ সিধার মতো আধ সের চাল আধ পো ডাল না দিয়ে লোকে বেশী ক'রেই দিত, ধামা বা ঝুড়ি ক'রে—চাল ডাল ঘি তেল সৈন্ধব লবণ, মশলা আনাজ—দশ-বারো দিন পর্যন্ত চলে যেত দুজনের অনেক ক্ষেত্রে।

এ ছাড়াও ছিল।

এইভাবে একজনের মারফৎ আর একজনের পরিচিত হয়ে হয়ে পরিচয়ের পরিধিও বেড়ে গিয়েছিল।

কাশীতে সেকালে সধবা-কুমারী-পূজো করার রেওয়াজ খুব বেশী ছিল। পূজোর সময় তো বটেই—তীর্থ করতে এলেও নতুন মহিলা যাত্রীরা এসব করতেন।

অন্নপূর্ণার রাজত্বে এসে সধবা-পূজোয় খুব মহাত্ম্য। সধবা বামুনের মেয়েকে অন্নবস্ত্র দান করলে আর কখনও ও দুটির অভাব থাকবে না— এই বিশ্বাস ছিল। সে প্রয়োজনেও পরিচিত কেউ কাছাকাছি থাকলেই অথবা জানতে পারলেই সতীদিকে ডেকে আনতেন। নিজস্ব গুরুপত্নী কি পুরোহিত পত্নী থাকলে আলাদা কথা—তবে নতুন যাত্রীদের পুরোহিত আর কোথায়—থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে ওঁকেই পছন্দ করতেন যাত্রীরা। জগদ্ধাত্রীর মতো রূপ, মধুর স্বভাব আর সর্বোপরি এই আশ্চর্য সতীত্ব— ঐ স্বামীকে কেউ অমন ভালবাসতে ভক্তি করতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস হয় না, কাশীর মতো দরিদ্র জায়গাতেও হাজার হাজার টাকার প্রলোভন

এসেছে ওঁর যৌবনকালে—সব জড়িয়ে সতীদি একটা কিম্বদন্তীর মতো হয়ে গিছলেন। যদি কোন সধবাকে দেবীজ্ঞানে পূজো করতেই হয়—তাঁকেই করতে চাইবে মানুষ, এ তো স্বাভাবিক।

সেও শাড়ি, সন্দেশ, দক্ষিণা। যাঁরা জানতেন ওঁদের অবস্থা, তাঁরা ইচ্ছে ক'রেই—এই ছুতোয় কিছু সাহায্য করবেন বলেই—একটা সিধাও দিতেন ঐ সঙ্গে—যাঁর যা সামর্থ্য।

এইটেই ছিল সতীদির যোগেযাগে চালানো।

॥ ৪ ॥

স্বল্পপরিচিত লোকদের মনে কিন্তু একটা প্রশ্ন থেকেই যেত—স্ত্রী এত কাণ্ড ক'রে সংসার চালান ; ঠাকুর্দা কিছু রোজগার করার, স্ত্রীকে একটু রেহাই দেবার চেষ্টা করেন না কেন ?

এটার সোজাসুজি উত্তর অবশ্য কোনদিনই পাই নি ঠিক। উত্তর পেয়েছি অন্য পরোক্ষ প্রশ্ন ক'রে।

ঠাকুর্দা আর কী কাজই বা করতে পারেন ?

এর সোজা জবাব—কেন, যজমানি ?

সত্যি, কাশীতে এত বাঙালী, ক্রিয়াকলাপও তো লেগেই আছে।

আর চালাচ্ছেও তো অনেকে।

বড় বড় পণ্ডিত যাঁরা, মহামহোপাধ্যায়—তাঁরা এসব কাজ করেন না, নিজেদের বাড়ির পূজোও করেন না অনেকে! বড়জোর বিদায় নিতে যান। তেমনি তাঁদের অবস্থাও ভাল নয়। প্রভাস পণ্ডিত মশাইকে আমরাই তো দেখেছি, অত বড় পণ্ডিত গুণী লোক—সামান্য চাকরি ক'রে দিনাতিপাত করেন, গৃহিণীর মুখনাড়া খান।

কিন্তু যজমানি করেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে অনেকেই এই কাশীতে দু'তিনখানা বাড়ি করেছেন, তাঁদের বাড়ির সিন্দুক খুললে কত মণ

বাসন বেরোবে তার ঠিক নেই। আমাদের পুরোহিত মশাইকেই তো দেখছি।

সুতরাং ঠাকুর্দা সম্বন্ধে সেই প্রশ্নটাই স্বাভাবিক।

বুড়ো হয়েছেন বটে, কিন্তু এমন বুড়ো হন নি যে যজমানি করা চলে না। চাকরি করছেন পরের—আর লক্ষ্মীপূজো মনসাপূজোয় দুটো ফুল ফেলে আসতে পারেন না ? শরীর খারাপ হয়, বড় বড় পূজো—দুর্গাপূজো, জগদ্ধাত্রীপূজো না হয় না-ই করলেন—ষষ্ঠীপূজো, মনসাপূজো, লক্ষ্মীপূজো করলেও তো ওঁদের সংসার বেশ চলে যায়। সতীদিকে এমন উঞ্ছবৃত্তি করতে হয় না।

'এই তো সরস্বতী পূজোয় ছেলেরা পুরুত পায় না। ছুটোছুটি করে একটা পুরুতের জন্যে—হা-পিত্যেশ ক'রে বসে থাকে নাড়ি চুঁইয়ে'—আমার মা-ই গজগজ করতেন, 'পৌষমাস, ভাদ্রমাস, চৈত্রমাসে—খন্দ-পূজোর বেলাতেও তো দেখি অমনি পুরুতের আকাল। ভদ্রলোক এগুলোও তো করতে পারেন। সারা মাস সাড়ে ছটা থেকে এগারোটা আর তিনটে থেকে ছটা—কয়লার দোকানে হাজরে দিয়ে বুঝি পাঁচ টাকা না ছ'টাকা পান—একটা লক্ষ্মীপূজোর দিনেই তো ও কটা টাকার ঢের বেশী উশুল হয়ে যাবে।'

অনেকদিন পরে এ প্রশ্নটা করেছিলুম রমেশ ঠাকুর্দাকে।

আমাদের সঙ্গে পরিচয়ের বেশ ক'বছর পরে।

একটা 'হ্যা— —।' বলে ইংরেজীতে যাকে বলে 'নন্ কমিটাল' শব্দ ক'রে—অনেকক্ষণ চুপ ক'রে ছিলেন ঠাকুর্দা।

ঐটে ছিল ওঁর একটা মুদ্রাদোষ। 'হ্যা' বলে শব্দটা উচ্চারণ ক'রে শেষের স্বরটা অনেকক্ষণ ধরে টানতেন। কোন প্রসঙ্গের আগে বা পরে অকারণেই ঐ সংক্ষিপ্ত শব্দটি ব্যবহার করা অভ্যাস ছিল। ওটা স্বীকৃতিবাচক বা সম্মতি-সূচক 'হ্যাঁ' শব্দ নয়—ওটা ওঁর কাছে অনেকখানি বক্তব্যের সার।

বহু চিন্তা, বহু দ্বন্দ্ব, বহু সমস্যার দ্যোতক।

অনেক না-বলা কথার ইঙ্গিত। মানে ওঁর কাছে।

সেদিনও ঐ শব্দটা উচ্চারণ ক'রে অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকলেন,—পৃথিবীর-বোধ-হয়-ক্ষুদ্রতম চোখ দুটি পিট্‌পিট্‌ করতে করতে।

তারপর বললেন, 'তোর মতো আরও অনেকে এ-কথাটা জিজ্ঞেস করেছে নাতি, উত্তর দিতে পারি নি। দিলে বুঝত না। হুতো মনে করত, বাজে ছুতো। তুইও যে সব বুঝবি তা নয়—তবে বলছি এই জন্যে যে, তুই তোর ঠান্‌দিকে খুব ভালবাসিস, তা আমি লক্ষ্য করেছি। আসলে তার জন্যে তোর কষ্ট হয় বলেই জিজ্ঞেস করছিস। সেইজন্যেই তোকে বলছি, কথাটা শোনা থাক। এ আমার একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া রইল—তোদের সকলের হয়ে তোর কাছে।···বুঝবি কি না বুঝবি, অত ভাবতে গেলে চলবে না। এখন না বুঝিস পরে বুঝবি। নয়ত আর কেউ বুঝবে।···তবে তুই যা এঁচোড়ে-পাকা দেখি—এই বয়সে গাদা গাদা নবেল-নাটক শেষ করছিস, তুই বুঝলেও বুঝতে পারিস!'

এই ব'লে একটু থামলেন, খক খক ক'রে কাশলেন কিছুক্ষণ ধরে। চোখের পিঁচুটি মুছলেন, তারপর তেমনি পিটপিটে চোখ আমার মুখের ওপর নিবদ্ধ ক'রে বলতে শুরু করলেন।

তবে চোখ আমার মুখের ওপর থাকলেও মনটা সেখানে ছিল না এটা বুঝতে পারলুম। কোথায় কোন্ সুদূরে চলে গিয়েছিল, এ কৈফিয়ৎ উনি আমাকে দিচ্ছিলেন না, সমস্ত পরিচিত মানুষকেই দিচ্ছেন, এখনই বললেন—কিন্তু তাই কি, মনে হ'ল এ উনি নিজেকেও দিচ্ছেন, নিজের বিবেককে। আর সঙ্গে সঙ্গে করুণভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করছেন।

'গ্যাখ—পুরুত বামুনের ঘরেই জন্মেছিলুম। আমার বাবাও যজমানি করতেন। পাড়া-গাঁ জায়গা, শুনতেই হরিনাভি-রাজপুর—পুরনো বর্ধিষ্ণু

গ্রাম। এখন কি হয়েছে জানি না, আমার ছেলেবেলায় খুবই ভগ্নদশা অবস্থা ছিল, বন-জঙ্গলে ভরা। যাদের ক্ষ্যামতা আছে তারা সবাই কলকাতায় বাস করত—কস্মিনকালে কেউ দেশে যেত না। বরং আরও দক্ষিণে, বারুইপুর কি তারও দক্ষিণে অনেক বড় বড় লোক থাকত শুনেছি। আমাদের ওখানে তো জ্ঞান হয়ে অব্দি দেখছি বড় বড় পুরনো বাড়ি সব ভেঙ্গে পড়ে যাচ্ছে, নয়ত বট অশথ গাছ গজাচ্ছে। কেউ আর আসেও না, মেরামতও করে না। হয়ত কোন শরিকের অবস্থা খারাপ, তার শহরে যাবার উপায় নেই—তারাই ভাঙ্গা বাড়ির যেটুকু বাসযুগ্যি আছে, ভোগদখল করছে। নয়ত আমাদের মতো দীন-দরিদ্র লোক,—আধপাকা আধকাঁচা বাড়িতে মাথা গুঁজে আছে। আমাদের বাড়ির দ্যাল ছিল পাকা, পাকা মানে ইটের—মাটির গাঁথুনি—মেঝেটা অবিশ্যি শানের, চুন দিয়ে পেটা, তখন এত বিলিতি মাটির চল হয়নি—চাল গোলপাতার।

‘তা ঐ যা বলছিলুম, তবু ঐ দেশেও আমার বাবা যজমানি ক’রেই—ক’রে-খেতেন। এক আধ বিঘে জমি ছিল, নামে-মাত্তর, বছরে তিন মাসের খোরাকও হ’ত না। যা কিছু ভরন্তর ঐ ক’ঘর যজমানের ওপরই।

‘হ্যাঁ, বাবা অবিশ্যি খাটতেনও—লক্ষ্মীপূজো, মনসাপূজো কি সরস্বতী পূজোয় দেখেছি— দূরদূরান্তেও যাচ্ছেন; ভোর থেকে উঠে শালগ্রাম মাথায় ধ’রে পাঁই পাঁই ক’রে ছুটছেন আলের ওপর দিয়ে; গ্রীষ্মকালে রাত চারটেয় উঠে বাড়ির পূজো সেরেই বেরিয়ে পড়তেন, শীতে সেটা বড়জোর পাঁচটা হ’ত, বেরোতেন অন্ধকার থাকতেই—ইংরিজী মতে বেস্পতিবার ধ’রে আমাদের পূজোটা হ’ত আর কি—দূর পাল্লায় আগে বেরিয়ে যেতেন, পৌছতে পৌছতে সকালটা হয়ে যায় যাতে। তাদের হুমকি দেওয়া থাকত, “রাত থাকতে থাকতে গোছগাছ ক’রে রাখবে,

এসে না দাঁড়াতে হয়। যদি ফিরে যাই—যার নাম বেলা চারটে—ইটি মনে রেখো।”

‘মনে তারা রাখত। প্রাণের দায়ে মনে রাখত। সত্যিই ওঁর সব বাড়ির পূজো সেরে ফিরতে ফিরতে চারটে সাড়ে-চারটে গড়িয়ে যেত। শীতকালে দেখেছি এক একদিন সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছে ফিরতে।

‘তেমনি ওতেই সংসারও চলত। আমরা একপাল ভাই বোন, বিধবা জ্যাঠাইমা, জাঠতুতো একটা আধ-পাগলা ভাই, এক বরে-খেদানো পিসী—বাবার মামাতো বোন; এতগুলি লোকের ডালভাত খেয়ে মোটা-কাপড় প’রে দিন কেটেই যেত একরকম ক’রে।

‘বোনদের বে-ও দিয়েছেন বাবা ওর মধ্যেই। দুটো তো দেখেই এসেছি, পরেরগুলোও কোন না দিয়েছিলেন। আর সে বে-ও বড় চাট্টিখানি কথা নয়, চেহারা তো আমাকে দেখেই মালুম পাচ্ছ—কেমন সব কন্দর্পকান্তি—এই রকমই ছাঁচ ধরো—উনিশ বিশ।

‘ঐটেই হ’ল কিন্তু কাল। এর ভেতরের দিক, মানে এই পূজোর অন্দরমহলের দিক—থ্যাটারে তোরা যাকে গিরিণরুম বলিস, সেটা আমার আগেই দেখা হয়ে গেল, পাছার ফুল না ছাড়তে ছাড়তে। জ্ঞান হওয়ারও আগে বলতে গেলে—মানে উরির মধ্যেই তো মানুষ। কত যে ফাঁকি তা অবশ্য তখনও জানি না। শুধু জানি যে বাবা পূজোয় বেরোবার আগে সেই শেষ রাত্তিরেই এক গাল চিঁড়ে কি এক গাল পান্তাভাত খেয়ে নিতেন, দুর্গাপূজোতে জগদ্ধাত্রী পূজোতেও, সারা রাতের পূজো হলে তো কথাই নেই—যেমন ধরো কার্তিক পূজো—সে তো দিব্যি ক’রে মাছ ভাত সাঁটতেন। বলতেন, “রাতের পূজো, রাতে না খেলেই হ’ল। দিনের পূজো সব আগের দিন রাত্তিরে খেয়ে যদি হয়—এটা হবে না কেন?” তিনি যে দিনের পূজোতেও দিনেই খেতেন—সেটা তখন মনে থাকত না।

‘তারপর কথাবার্ত্তারাও তেমনি। ফিরে এসে নৈবিদ্যির পুঁট্লি খুলে

যে গালাগাল দিতেন রে ভাই—কি বলব।…কে মোটা চাল দিয়েছে, কে ক্ষুদের মতো ভাঙ্গা চাল, কে কম দিয়েছে, কে ধুতির বদলে গামছা দিয়েছে, কে গুণচটের মতো কাপড় দিয়েছে—এই নিয়ে অশ্রাব্য গালাগাল দিতেন যজমানদের, মানে সে মুখ খারাপ ক'রে একেবারে। শাপশাপান্তও করতেন অনেক সময়। "সব্বনাশ হবে, সব্বনাশ হবে, নিব্বংশ হবে সব। দেবতা-বামুনকে ফাঁকি দিয়ে যে পয়সা জমাচ্ছেন সে পয়সা ওষুধে ডাক্তারে বেরিয়ে যাবে, শ্মশানঘাটে খরচ হবে। ভোগ করবার লোক থাকবে না, যক দিয়ে যেতে হবে"—এমনি ধারা।

'খুব খারাপ লাগত ভাই, সত্যি বলছি।

'কেন লাগত তা জানি না। ঐ বাড়িতেই তো আমরা এতগুলো প্রাণী ছিলুম—কই, আর কারও তো লাগত না! বরং দাঁত বার ক'রে হাসত আমার ভাইবোনেরা।

'বোধহয় আমাকে সংসারে পাঠাবার সময় সাধারণ বিধাতার হাত-জোড়া ছিল, ভিন্ন বিধাতার ওপর ভার পড়েছিল আমাকে গড়বার। আমার মনে হ'ত, আহা, ওরা ওদের অবস্থামতো সব দিয়েছে, আর এই বারোমেসে পূজোতে কে এত ছিষ্টি খরচা করে। এ নিয়ে এত বলবার কি আছে? এত যদি ঠকেছি মনে করেন, আগে থাকতে বন্দোবস্ত ক'রে নেন না কেন, এত পেলে যাব—নইলে যাব না?

'তবু কি জানিস, বাবা যেমন বিদ্যে নিয়ে পুরুতগিরি করতেন, পাঠশালে পড়া শেষ হবার পরই যদি আমাকে ঐ জোয়ালে জুড়ে দিতেন, —দুটো অং বং চং, নিজে যা জানতেন তাই শিখিয়ে—আমিও হয়ত অত কিছু ভাবতুম না। বাবার মতোই দিনগত পাপক্ষয় ক'রে যেতুম! পাঠশালার পড়া শেষ করতেই ঢের বয়স হয়ে গিয়েছিল, তার অনেক আগে পৈতে হয়ে গেছে।

'বাবা গেলেন অন্য পথে। তাঁর মনে মনে একটা ভয় ছিল, একটা

দুঃখুও বলতে পারো—তিনি লেখাপড়া জানতেন না ব'লে ভরসা ক'রে কোন বড় জায়গায় ভাল জায়গায় যজমানি করতে যেতে পারতেন না। পাছে কেউ ভুল ধরে ফেলে, কোন মন্তরের মানে জিজ্ঞেস করে। সে সময়টা ইংরেজী-জানা বাবুদের খুব একটা বাহাদুরী ছিল, পুরুত বামুনদের অপদস্থ করা। তাছাড়া এদান্তে যজমানরাও একটু আধটু লেখাপড়া শিখছিল বলে বাবা মনে করলেন একেবারে ফাঁকিবাজীর ওপর আর চলবে না, পেটে একটু কিছু থাকা দরকার।···

'একটা ছড়া খুব চলত আমাদের আমলে। অধিক বিদ্যে কানে ফুঁ, অল্প বিদ্যে শাঁখে ফুঁ, আর ন চ বিদ্যে উনুনে ফুঁ—বামুনের এই তিন কম্ম। মানে যে লেখাপড়া জানে সে গুরুগিরি করবে, কানে মন্তর দেবে; যে তার চেয়ে কম জানে সে যজমানি করবে, আর যে কিছুই জানে না সে রান্না করবে, রাঁধুনী বামুন হবে। তা সে আর ছিল না, ন চ বিদ্যেই শাঁকে ফুঁ চলছিল। বাবার মনে হ'ল যে এভাবে আর চলবে না, একটু অন্ততঃ মন্তরের উচ্চারণগুলো রপ্ত হওয়া দরকার। সেই জন্যেই—হরিনাভিতে এক সসেমিরে গোছের টোল ছিল, আধমরা, নিহাৎ সামান্য কিছু সরকারী বৃত্তির ব্যবস্থা ছিল ব'লেই চলত—সেইখানে ভর্তি ক'রে দিলেন। আমাদের বাড়ি থেকে ক্রোশখানেকের মতো পথ, বেলা দুপুর নাগাদ খেয়ে-দেয়ে রওনা দিতুম, বাড়ি ফিরতে যার-নাম রাত আটটা।

'তা হোক—তখন চোদ্দ-পনেরো বছর বয়স—দু'ক্রোশ পথ হাঁটা আমার কাছে কিছুই নয়। আমার মনটা ভেঙ্গে গেল অন্য কারণে! তখন ইংরিজী পড়ার রেওয়াজ হয়ে গেছে, আমার পাঠশালার সাথী যারা তারা সকলেই ইংরেজী ইস্কুলে ভর্তি হ'ল—আমার মনে হ'ল আমি এ কি শিখতে যাচ্ছি!

'সংস্কৃত তখন আর টোলে কেউ শেখে না—ইংরেজী ইস্কুল যেটুকু শেখায় তাতেই কাজ চলে যায়—নিহাৎ আমাদের মতো যাদের অন্ন

কোন গতি নেই, এমনি দু'-চারটি ছাত্র নিয়ে টোল চলে। একেবারে কোন ছাত্র না থাকলে 'গ্র্যাণ্ট' বন্ধ হয়ে যাবে—তাই অধ্যাপক মশাই-ই একরকম খুঁজেপেতে ছাত্র ধরে আনতেন।

'তবু, কী আর করা যায়, এই ভেবেই পড়তে লাগলুম। কাব্য আর ব্যাকরণ, বাবা বলেছিলেন পড়তে। পড়ব কি—পণ্ডিত মশাই আজ অমুক জায়গায় বিদেয় নিতে যাবেন, অমুক গ্রামে দীক্ষা দিতে যাবেন, অমুকের পৈতেতে আচার্যির কাজ করবেন; অমুকের বে—তাঁর লেগেই থাকত একটা না একটা। পডার দিনের থেকে অনধ্যায়ের দিন তিনগুণ। তিনিই বা কি করবেন, তাঁকেও খুব দোষ দিই না—আমরা কেউই মাইনে দিতুম না, সরকারী বৃত্তিটুকু ভরসা। সেও ঐ নামে মাত্তরই। তাতে তো আর দিন চলে না—তাই গুরুগিরি পুরুতগিরি অধ্যাপকগিরি সবই ক'রতে হ'ত। আগেকার আমলে শুনেছি টোলেই ছাত্ররা খেতে পেত থাকত—সে দিন আর ছিল না। সেই জন্যে যে পড়াটা দু'বছরে হবার কথা—সেটা তিন বছরেও শেষ হ'ত না।

'এধারে আমার বাবা অধৈর্য হয়ে উঠলেন। আদ্য পরীক্ষা দেব বলে তৈরী হচ্ছি, বাবা বললেন, "আর পরীক্ষার দরকার নেই, টোল ছেড়ে দে। আমার যেটুকু দরকার হয়ে গেছে, এতেই কাজ চলবে। এখন আমার কাছে ক্রিয়াকর্মের প্যাঁচগুলো শিখে নে—তাতেই হবে, আমাদের দশকর্মের কাজ, ওর বেশী লাগবে না।"

'এতদিন ভাই বাবার কথা অন্ধভাবে মেনে এসেছি। নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধেও। কিন্তু এবার আর পারলুম না।

'আসলে অন্ধ ছিলুম বলেই এতকাল মেনেছি, অত অসুবিধে হয় নি। বাবাই একটুখানি চোখ ফুটিয়ে দিতে গিয়ে নিজের পায়ে কুড়ুল মারলেন।

'লেখাপড়া যাকে বলে তা কিছুই শিখি নি, তবু একটু যা মাথায় গিছল তাতেই বুঝেছি দশকর্ম অত সহজ নয়। পণ্ডিত মশাই নিজেও

ওসব ক্রিয়া তত জানতেন না, তবে তাঁর বাড়িতে পুঁথি ছিল ঢের। তিনি প্রায়ই একটি ছড়া কাটতেন—আমার বাবাকে উদ্দেশ ক'রেই, পরে বুঝেছিলুম—"চণ্ডী মুণ্ডি কুশুণ্ডি পার্বণ—এই চার নিয়ে পুরোহিত ব্রাহ্মণ"। বলতেন, পাকা পুরোহিত হ'তে গেলে এই চার কাজ শেখা দরকার। চণ্ডী অর্থাৎ কালীপূজো ; কালীপূজোয় যত ন্যাস মুদ্রা জানা দরকার হয়—এত দুর্গাপূজোতেও লাগে না। মুণ্ডি মানে মণ্ডল তৈরী করা—এখানে দুর্গাপূজোতে তো দেখেছিস—আমাদের গণেশ মহল্লার সতীশ ভট্চায পঞ্চগুঁড়ি দিয়ে সর্বতোভদ্র মণ্ডল তৈরী করে—ঐ লোকটা জানে দশকর্ম, সব পুঁথি মুখস্থ—হ্যাঁ, যা বলছিলুম, কুশুণ্ডি মানে কুশণ্ডিকা যে করাতে জানে—ভাল ক'রে—তার যজ্ঞের বিধি-ব্যবস্থা মোটামুটি জানা হয়ে যায় ; আর পার্বণ মানে পার্বণ শ্রাদ্ধ। পার্বণ শ্রাদ্ধ যে নিখুঁতভাবে করাবে—তার কাছে সপিণ্ডকরণ খেলার সামিল।

'ওঁর এই কথাগুলো শুনতুম, আর বাড়ি এসে বাবার যা দু'একখানা পুঁথি ছিল সেইগুলো, কিম্বা, অনধ্যায়ের দিনগুলোয়—অত দূর হেঁটে গিয়েছি একটু তো জিরুতে হবে—পণ্ডিত মশাইয়েরই ক্রিয়াকর্ম বারিধি, নিত্যপূজা পদ্ধতি, দুর্গাপূজোর তিন-চার মতের পুঁথি—উল্‌টে দেখতুম।

'তাতে যা বুঝেছিলুম—মন্ত্রের মানে, ক্রিয়ার মানে, ন্যাস মুদ্রার মানে—বুঝেছি তো ছাই, হয়ত তিন আনা বুঝেছি, তেরো আনাই বুঝি নি—তান্ত্রিক ক্রিয়া তো কিছুই বুঝি নি—তবু একটা যা ঝাপসা ঝাপসা ধারণা হয়ে গিয়েছিল তাতেই বুঝেছিলুম—বাবা কিছুই জানেন না আর যজমানদের কী ফাঁকিই দেন! তারা সরল বিশ্বাসে ওঁর ওপর নির্ভর ক'রে নিশ্চিন্ত থাকে—উনি একেবারেই ঠকিয়ে চলে আসেন। তাতেও পাওনা কম হ'লে অত রাগ, অত শাপমন্যি।

'আরও কি বুঝলুম জানিস—দোষ কোন পক্ষেই কম নয়। ছোটবেলাতেই—মানে পৈতের পর আর কি, বাবা কদিন সঙ্গে ক'রে

ঘুরেছিলেন। সেই সময়ই দেখেছিলুম, যজমানরাও—একটু লেখাপড়া শিখেছে কি শেখে নি, হয়ত ঘোড়ার পাতা পর্যন্ত ইংরেজীর দৌড়—তারা কী ঘেন্নার চোখেই না দেখে পুরুতকে। মেয়েরা একরকম, তারাই পূজোর যোগাড় করে, ছেদ্দাভক্তিও তাদের আছে, পুরুষরা—বিশেষ বামুন কায়েতের ঘরের পুরুষরা—বোধহয় কুকুর-বেড়ালেরও অধম ভাবে পুরুত জাতটাকে।

'আমিই ভুল বলছি, কুকুর বেড়াল তো শখ ক'রে পোষে লোকে, ভালবাসে, আদর করে; এদের চোর জোচ্চোর বলেই জানে—পুরুতদের। ডাকতেও হয়—সমাজ আছে, দশবিধ সংস্কারে না ডাকলে চলে না। বে, শ্রাদ্ধ, অন্নপ্রাশন, পৈতে—এগুলো তো চাই, পুরুতের যেটুকু কাজ সেটুকু নিদেন লোকদেখানো না হ'লে আসল যেটা—খ্যাটের ব্যাপার সেটা তো হয় না, তাই ডাকতেও হয়, কিন্তু কেবলই মনে করে ব্যাটারা ঠকিয়ে নিচ্ছে।

'তাছাড়া, গরীব-দুঃখী মুখ্যু-সুখ্যু লোক যারা—তারা সাধ্যমতো দেয়। যারা বাবুভাই, নিজেদের লেখাপড়া জানা লোক মনে করে—তারা সাধ্য-মতো কম দিতে চেষ্টা করে। বে'তে হাজার হাজার টাকা খরচ হচ্ছে, বিদ্ধিশ্রাদ্ধর ফর্দ করতে বসো দিকি, সেখানে যত পারবে কারণকম্মি করবে। ছ'পয়সা সেরের চাল, তাও যদি আধসের দিয়ে পারে তো তাই দেয়। তেমনি পুরুতরাও হয়ে গেছে ছ্যাচড়া—তারাও চায় যত রকমে পারে প্যাঁচ দিয়ে—এটা ওটা ভাঁওতা দিয়ে বেশী আদায় করতে।...এই টানাটানিটাই আমার খুব খারাপ লাগত। লাগত বলি কেন, এখনও লাগে। দেখছি তো চারদিকেই—'

এই ব'লে চুপ ক'রে গেলেন ঠাকুর্দা। আগে ভাবলুম দম নিতেই বুঝি থামলেন—কিন্তু একটু পরে মনে হ'ল তা নয়, উনি যেন মনের কোন্ অতলে তলিয়ে গেছেন। এখানে দেহটা থাকলেও মনটা চলে গেছে সুদূর অতীতে।

আরও খানিকটা সময় নিয়ে আস্তে আস্তে বললুম, 'তারপর ?'

'তারপর ?···তারপর আর কি, ঐ নিয়েই খিটিমিটি বাধল। বিষম অশান্তি, বাবা গোড়ায় চেঁচামেচি করলেন, তারপর গালাগাল, কাকুতি-মিনতিও করলেন শেষে। মাকে দিয়ে বলালেন, জ্যাঠাইমাকে দিয়ে—তাঁরা কান্নাকাটি করলেন। মা—একদিকে ছেলে একদিকে স্বামী—দোটানায় পড়ে একদিন ঢিব্ ঢিব্ ক'রে আমার সামনে মাথা খুঁড়লেন। জ্যাঠাইমা বোঝালেন, "তুমি বড় ছেলে, এতবড় সংসারের দায়িত্ব একদিন তোমার ঘাড়েই পড়বে, তুমি এমন অবুঝ হ'লে চলবে কেন ? মানুষে জীবিকার জন্যে কত কি হীন কাজ পর্যন্ত করছে—দেখছ তো চারদিকে—এ তো তবু সম্মানের কাজ। বেশ তো, তুমি যা জানো সাধ্যমতো জ্ঞানমতো সেইভাবেই করবে, ফাঁকি দেবে কেন ? তাতে দু'ঘর কম টানতে পারো তাই টানবে। এখুনি তো তোমায় এত খাটতে হচ্ছে না, এখনও তো মাথার ওপর ঠাকুরপো রয়েছেন। আর ছ্যাঁচড়াবিত্তি না পোষায়, তাও ক'রো না। যে যা দেয় তাই নিয়ে চলে আসবে—একটু কিছু তো দিতেই হবে—যে যতই কম দিক তাই নেবে।"···

'ভাল কথাই বলেছিলেন। কিন্তু আমি জানতুম—এ কাজে ঢুকলে অত সহজে পার পাবো না। যার যা—একদিন ঠিক অমনিই ছ্যাঁচড়াবৃত্তি ক'রতে হবে, একদিন অমনিই ফাঁকি দিতে হবে। আজ বাবা আছেন ঠিকই, যখন থাকবেন না, এই নারদের সংসার চালাতে হবে—তখন আমাকেও একবেলায় কুড়ি ঘর বজায় দিতে হবে, তখন ঐ কোনমতে ফুল ফেলা ছাড়া আমারও গতি থাকবে না, মনে মনে বলতে হবে, ঠাকুর সবই তো বুঝছ, আমার আর সময় নেই। "আমি ঠাকুর হাব্‌লা গোব্‌লা, ভোগ খাও ঠাকুর খাব্‌লা খাব্‌লা"—সেই রকম আর কি।···

'পূজো, জানিস নাতি, অনেক রকমেই করা যায়, দশ দিকপালের আলাদা আলাদা নাম ক'রে ক'রেও করা যায়, গণেশাদি পঞ্চদেবতাও

তাই—আবার একটা ফুলের পাপড়ি দিয়ে "ইন্দ্রাদি দশদিকপালেভ্য নমো, গণেশাদি পঞ্চদেবতাভ্য নমো," বলেও সারা যায়। মরশুমের দিন তাও হয়ে ওঠে না, 'ওঁ' বলে একটা হুঙ্কার ছেড়ে, দুটো হাততালি দিয়ে কটা ফুল ছিটিয়ে দিলেই হ'ল। কে দেখতে যাচ্ছে, কে পরীক্ষা নিচ্ছে?

'মোদ্দা কথা—ওঁরা যত বলেন আমার তত জেদ চেপে যায়। শেষে একদিন পরিষ্কার বলে দিলুম বাবাকে যে, "আপনার নাম ক'রেই দিব্যি গালছি, যজমানি কাজ জীবনে করব না—খেতে পাই ভাল, না পাই ভাল"।'

আবারও থামলেন। মনে হ'ল গলাটা ধরে এল যেন। চোখ দেখা যায় না ভাল ক'রে তবু মনে হ'ল সে দুটোও ছলছল করছে। হয়ত অনুশোচনা, হয়ত অকৃতজ্ঞতাবোধের লজ্জা।

আরও খানিক পরে, আবারও মৃদুকণ্ঠে মনে করিয়ে দিলুম, 'তারপর?'

'হ্যা— —।' ক'রে একটা হুঙ্কার ছেড়ে বললেন, 'তারপর এই। সেই জন্যেই যজমানী আর করতে পারি না। বাবা বেঁচে থাকলে তাঁর পায়ে ধরে মাপ চেয়ে কথা ফিরিয়ে নিতুম। সে পথ আর নেই।···তা ছাড়াও দিব্যি অত মানি না, তবে এ নিয়ে অনেক দুঃখ দিয়েছি তাঁকে—তাঁদের, অনেক বেইমানী করেছি, এখন বৌকে সুখে রাখার জন্যে সে কাজ করলে নরকেও আমার ঠাঁই হবে না। তার চেয়ে ভিক্ষে ক'রে খাব সেও ভাল, নইলে—মা গঙ্গার তো জল শুকোয় নি, বুড়োবুড়ি গিয়ে গা-ঢালা দোব।'

এই বলে একেবারেই চুপ করলেন। পাছে আমি আরও প্রশ্ন করি, আরও খোঁচাই—উঠে চলেই গেলেন সেখান থেকে।

॥ ৫ ॥

এইরকমই মানুষ ছিলেন রমেশ ঠাকুর্দা।

সেকেলে বুড়ো মানুষ, লেখাপড়া কম জানতেন, পাড়াগাঁয়ের লোক—কিন্তু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীটা ছিল একেবারে আমাদের কালের। তাঁর কালের সঙ্গে তিনি কিছুতে খাপ খাওয়াতে পারতেন না তাই। সব জিনিসটাই তিনি নিজের মতো ক'রে ভাবতেন—নিজের মনে সত্যমিথ্যা দোষগুণ ভালমন্দ যাচাই ক'রে নিতেন। সাধারণ নীতিদুর্নীতি, পাপপুণ্য সম্বন্ধেও তাঁর মতামত ছিল বেয়াড়া—কারও সঙ্গেই মিলত না।

একবার মনে আছে—আমাদের বাড়িতে কোন ঘটনা নয়—বোধহয় প্রয়াগবাবুর মা কী একটা বার-ব্রত উপলক্ষে ব্রাহ্মণ ভোজন করাবেন, তারই ফর্দ হচ্ছিল। আমার মনে আছে, কারণ আমি সেখানে ছিলুম। ব্রাহ্মণের তালিকা করার সময় রমেশ ঠাকুর্দা ফট্ ক'রে নগেন মল্লিকের নামটা ক'রে বসলেন।

বেশ মনে পড়ে, কিছুক্ষণের জন্যে ঘরসুদ্ধ লোক নিস্তব্ধ হয়ে গেল—স্রেফ্ বিস্ময়ে। কারও মুখে একটা কথা সরল না।

এমন লোকের নাম যে করা যায়, কোন পুণ্যকর্মের উদ্দেশ্যে এমন লোককে ডেকে ব্রাহ্মণ ভোজন করানো যায়—এ কোন সুস্থ সচেতন-মস্তিষ্ক লোক ভাবতেও পারে না।

এমন কি, সেই বয়সেই, আমিও জানতুম ভদ্রলোকের কেলেঙ্কারীর ইতিহাস। নগেন মল্লিককে, প্রায় সবাই চেনে, মানে এখানের বাসিন্দারা সকলে। বিশ্বনাথের গলি ছাড়িয়ে গঙ্গার দিকে যেতে—মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের শিবমন্দিরের পরেই যে একসার দোকান, তারই একটা ওঁর ছিল, "কারবাইড্/গ্যাসের মশলা/এইখানে পাওয়া যায়" দেওয়ালের গায়ে বড় বড় হরফে আলকাতরায় লেখা—যাঁরা সে সময়

কাশীতে গেছেন তাঁরা দেখে থাকবেন—মনেও আছে নিশ্চয়। ভদ্রলোক নাকি তাঁর এক বিধবা মাসীকে নিয়ে—আপন মাসী—এখানে এসে বাস করছেন স্বামী-স্ত্রীর মতো। ছেলেমেয়েও অনেকগুলি হয়েছে। এমনি খুবই ভদ্রলোক, শুধু কারবাইডে চলে না বলে, কাঠকয়লা, কিছু কিছু লোহার জিনিস, বালতি প্রভৃতিও রাখেন আজকাল। তাঁর চরিত্র যেমনই হোক, তাঁর স্বভাব কি তাঁর সততা সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত কেউ কোন খারাপ ইঙ্গিতটি পর্যন্ত করতে পারে নি। তবু—একে তো বে-আইনী সম্পর্ক—তার ওপর আপন মাসী!

লক্ষ্মীবাবুও সেখানে ছিলেন—বাড়িওলা লক্ষ্মীবাবু, প্রয়াগবাবু ওঁর কী রকম দূর সম্পর্কে মামা হন—তিনিই প্রথম নিস্তব্ধতা ভাঙ্গলেন, 'ও নামটা কি ক'রে করলেন কাকা! আপনার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল?'

আর একজন কে—মনে নেই ঠিক—বলে উঠলেন, 'তা ওঁর কি আর ভীমরতির বয়স হয় নি? ষাট তো পেরিয়ে গেছে কবেই। নেহাৎ প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করেন তাই—'

প্রয়াগবাবুর মা তাড়াতাড়ি সামলে নিতে গেলেন, 'না না, ও তামাশা করছে। তোরা অমন করছিস কেন?'

ঠাকুর্দা যেন বোমার মতো ফেটে পড়লেন এবার।

'হ্যা— —। বলি, ভীমরতিটা কে দেখছে আমার তাই শুনি! নগের নাম করতে সব চমকে উঠলে যে একেবারে! খুব সব সাধুপুরুষ আমরা—না? কেউ কখনও কিচ্ছু করি নি, ভাজা মাছটি উল্টে খেতেও জানি না—সবাই এক একটি ধম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির! রথ তো নেই, টাঙ্গা কি এক্কায় চড়লে চাকা চার আঙ্গুল উঠে থাকবে মাটি থেকে, মলে শিবদূত আর বিষ্টুদূতে মারামারি লেগে যাবে—এ বলবে কৈলেসে নে যাই, ও বলবে গোলকে!'

তারপর, তেমনি পিটপিটে চোখে ভ্রূকুটি ক'রে সকলের মুখের দিকে একবার চেয়ে নিয়ে বললেন, 'কেন, নগে কি বামুনের ছেলে নয়, না কি পৈতে ফেলে দিয়েছে, না তিনসন্ধ্যে গায়ত্রী করে না? না কি অজাত-কুজাত বিয়ে করেছে? মানলুম, বে-করা নয় এমন মেয়েছেলের সঙ্গে ঘর করে। তা এই যে লম্বা ফর্দ হচ্ছে বামুনদের, বড় বড় টিকি-আলা সব ব্রাহ্মণ—এরা কি সবাই চরিত্রবান নিষ্কলঙ্ক পুরুষ? ভাল ক'রে খবর নিয়ে তবে তোমরা ফর্দ করছ তো?'

হ্যা হ্যা ক'রে একটা তিক্ত হাসি হেসে নিয়ে আবারও বললেন, 'মাসী স্বীকার করছি। ন বছরে বে হয়েছিল, দশ বছরে বিধবা হয়েছে। বে'র ঐ আট দিন ছাড়া বরের মুখ দেখে নি, বে যখন হয়েছে তখন কিছুই জানে না—বর-কনের ব্যাপার, কোন যৌবন লক্ষণ প্রেকাশ পায় নি।··· নিতুঁষি মেয়েটাকে বাপের বাড়িতে ভূতের মতো খাটাচ্ছিল, বলতে গেলে একটা কিষেণের কাজ করাচ্ছিল একফোঁটা মেয়েকে দিয়ে। এ তো শোনা কথা নয়, বনপলাশপুরের ও ভটচায্যি গুষ্টিকে আমি খুব ভাল ক'রে জানি—ধানের পাট থেকে, গরু থেকে, ক্যানেস্তারা ক্যানেস্তারা ক্ষার কাচা—সব ঐ মেয়ে। নেহাৎ একাদশীতে উপোসটা করাত না, মা বেঁচে—একটু ক'রে দুধ খেতে দিত!···কী সমাচার—না কাজকম্মের মধ্যে না থাকলে বেচাল শিখবে, স্বভাব-চরিত্তির খারাপ হয়ে যাবে। অথচ ওর চোখের সামনেই ওর বাবা শিষ্যির বিধবা বোনের সঙ্গে রাত কাটিয়ে আসত।'

বোধহয় দম নেবার জন্যেই থামতে হ'ল একটু, কিন্তু সে কয়েক মুহূর্তই। আর কেউ কথা বলার সুযোগ পেল না সে অবসরে। উনি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শুরু করলেন, 'সেই মেয়েটাকে নগে যদি উদ্ধার ক'রে এনে এখানে স্বামী-স্ত্রীর মতো কাটায়—দোষটা কি? একটা মন্তর পড়িয়ে নিলেই তো হতো—কিম্বা খাতায় লিখে বে করলে তো ট্যাঁ-ফো করতে

পারতে না তোমরা? সেইটেই ওদের ভুল হয়েছে।···যখন এখানে আসে—নগের তখন সাতাশ বছর বয়েস, বে'ও করেনি কিছুই না, মেয়েটার আঠারো। কী বয়েস ওদের?···তোমরাও তো নগেকে দেখছ, ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী বাদ নেই, স্নান পূজো—কাউকে ঠকায় না, কোন কলহ-বিবাদে যায় না, কেউ বলতে পারবে না নগেন মল্লিক কারও একটা আধলা হরেহস্মে নিয়েছে!'

তারপর আরও একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'যাদের জিনিস, যারা এসে এই কাশী শহরে রটিয়ে দে গেল কেচ্ছাটা—সেই মল্লিক গুষ্টি এসে এখন ওদের বাড়িতেই উঠছে, ভটচায্যি গুষ্টিও। এক পয়সা খরচা নেই, তোফা মচ্ছি মাংস খেতে পায় দুবেলা, জামাই আদর—মায় রাবড়ি রসগোল্লা পর্যন্ত, পাল-গুষ্টি এসে ওঠে এক এক সময়। ওরাও তেমনি বোকচন্দর, আত্মীয়স্বজন কেউ এলে কিতাত্থ হয়ে যায় একেবারে! হ্যা— —!'

লক্ষ্মীবাবু বিদ্রূপের সুরে বললেন, 'তাহলে তো কোনদিন আপনি কেদারঘাটের তপন ভটচার্যিরও নাম করবেন!'

'করবই তো! আলবৎ করব। আমার যদি বামুন ভোজন কি বিদেয় দেবার অবস্থা হ'ত—আমি আগে ওদের ডাকতুম···কেন, তপন ভটচার্যি কি অন্যায়টা করেছে তাই শুনি?···না খুড়ি, তুমিই বলো। তুমিও ব্রাহ্মণের বিধবা, নিষ্ঠেবান ঘরের মেয়ে, তোমার কাছেই আমি বিচের চাই।'···

তারপর হঠাৎ গলা নামিয়ে এক ধরণের নাটকীয় ভঙ্গীতে বললেন, 'তপন ভটচার্যির জ্যাঠতুতো দাদা ঘোর মাতাল, মদ মেয়েমানুষ জুয়ো—কোন গুণ বাদ নেই। আর বৌটো,—তাকে এরা সবাই দেখেছে, লক্ষ্মীপ্রীতিমের মতো, শান্ত ধীর নম্রস্বভাব—দেখতে তো অপরূপ সুন্দরী। ···অমন বৌ—তা একদিনের জন্যে সুখ পায় নি। মদের ঘোরে এসে

ধরত, এক এক দিন আধমরা ক'রে ছাড়ত।...চোরের মার মেরেছে ঐটুকু মেয়েটাকে। কী অপরাধ—না বর ভাড়া খাটাতে চাইত, মেয়েটা রাজী হ'ত না। বলেছিল, "নিজের ধর্ম্ম ক্ষুইয়ে যদি স্বামীকে খাওয়াতে হয় সে খাওয়াব—যদি কোনদিন অক্ষ্যাম হয়ে পড়ো, যেমন ক'রেই হোক চালাব—কিন্তু তোমার মদের আর জুয়ার খরচ যোগাতে নিজের এহকাল পরকাল নষ্ট করব না। তাতে যা করতে হয় করো।"...

'পাশাপাশি বাড়ি, তপন সবই দেখত, ডাক্তারী পড়ছে ও তখন, ফোর্থ ইয়ার, খুব ভাল ছেলে ছিল, পাস করলে আজ ওর পসার খায় কে! ...শেষে যেদিন জোর ক'রে মুচড়ে হাতটা ভেঙ্গে দিলে বৌটার—সেদিন আর থাকতে পারল না, এক ঘুষিতে দাদার নাক ফাটিয়ে দিয়ে বৌটাকে নিজের বাড়িতে এনে তুলল। ও কিছু অলেহ্য করতে চায় নি প্রেথমটায় —কিন্তু, ওর বাড়িতে তো কেউ ছিল না, মা মরে গেছে, বাপ বিদেশে, একটা চাকর আর ছোট দুটো ভাই। এই নিয়ে তুমুল ঘোঁট শুরু হয়ে গেল আপ্তকুটুম মহলে, কী সমাচার, না বৌদি ওর সঙ্গে বেরিয়ে এসেছে, ও তাকে নষ্ট করেছে। শুনতে শুনতে শেষে ধিৎকার ধরে গিয়ে বৌদিকে নিয়ে কাশী চলে এল—নিজের আখের, পৈত্রিক সম্পত্তির মায়া ত্যাগ ক'রে। বরটা হুমকি দিতে কাশীতে এয়েছিল, তপন কোতোয়ালীতে গিয়ে ডায়েরী ক'রে এসে আর একটি ঘুষি মারতেই ফিরে চলে গেছে— আর আসে নি।

'তা এই তো বিত্তান্ত। তপনকে তোমরা দেখেছ সবাই। ছোট্ট মুদীর দোকান ক'রে খায়, কারও সাতেও থাকে না পাঁচেও থাকে না। বৌটাকে প্রাইভেটে পড়িয়ে দুটো পাস করিয়েছে, তা ইল্‌লিগল্ কনেকশ্যন তোমাদের মতে তো—তাই চাকরি পেলে না। বাড়িতে বসে বিনা-মাইনেয় পাড়ার মেয়েদের পড়ায়—অমন পনেরোটা মেয়ে এসে জোটে, সব খাসা খাসা বামুনের ঘরের মেয়ে তারা। তাতে দোষ নেই, তার

দোকানে ধারে খেয়ে টাকা ফাঁকি দেওয়ায় দোষ নেই—বামুন ভোজনের নেমন্তন্ন করলেই যত দোষ?…হা আমার কপাল রে!'

বলতে বলতে আরও উত্তেজিত হয়ে ওঠেন ঠাকুর্দা। ঠোঁটের কোণে ফেনা জমেছে অনেকক্ষণই, এখন প্রবলবেগে থুথু ছেটকাচ্ছে—সে এক বীভৎস মূর্তি! ওঁর এ চেহারা চেনে সবাই, থামাবার চেষ্টা বৃথা—তবু প্রয়াগবাবুর মা কী একটা বলতে গেলেন, ঠাকুর্দা সে অবসরই দিলেন না।

বললেন, 'তোমাদের ও পরম নিষ্ঠেবন্ত বামুনও ঢের দেখেছি, ব্রাহ্মণ-কুলচূড়ামণি, শাস্ত্রবাক্য ছাড়া কথা নেই, কথা কইতে গেলে—বিশেষ মুখ্যু মানুষদের সঙ্গে—আদ্ধেক কথা সংস্কৃতয় বলেন, পরগোত্তরে খান না, খুব শুদ্ধাচার, সকালে উঠে পাঁজি খুলে বলে দেন কোন্ দিন কি রান্না হবে—ইদিকে ছাখো ঘরে ঘরে ব্যাভিচার, বুড়ো বয়েস পজ্জন্ত কলির কেষ্ট সেজে বসে আছেন এক একজন—বিধবা ভাজ, ভাদ্দর বৌ, ভাইপো-বৌ, সধবা নাতনী—কেউ বাদ যায় না। এঁরাও শাস্তরবেত্তা বামুন, তাঁরাও এক একটি খড়দর মা-গোসাঁই, এসে তোমাদের যজ্ঞিতে কাঠি দিলে তোমাদের চোদ্দপুরুষ উদ্ধার একেবারে, ঐ বামুন এসে অং বং চং আউড়ে বিদেয় নিয়ে গেলে তোমরা কিতাত্থ।…এই তো?…তা খাওয়াও, ঐ সব বামুনকেই খাওয়াও।'

'তা এই কি সব?' লক্ষ্মীবাবু যেন ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেসা করেন।

ওঁর ঐ মূর্তি দেখে সকলেই যেন কিছুটা ঘাবড়ে গেছেন।

'তা কেন হবে! নেই কি, ভাল বামুনও আছে। বড় বড় সত্যিকারের পণ্ডিত—কাশীতে যেমন—এমন আর কোথায়? তবে তারা কেউ একপাত নুচি খেতে তোমার বাড়িতে ছুটে আসবে না। এক অধ্যাপক বিদেয় ছাড়া—তারা কেউ বাড়ি থেকে নড়ে না। তাও—অধিষ্ঠান নেওয়াটা কর্তব্য বলে মনে করে তাই—নইলে একখানা সরা আর দুটো

সন্দেশের লোভ তাদের নেই···যাক গে, এসব বলে মুখ নষ্ট, আমার সঙ্গে বাবা তোমাদের মিলবে না, তোমাদের মতো ফর্দ তোমরা করো।···হ্যা——আমার একপাত জুটলেই হ'ল। হে, হে, হে!'

নিজেই আব্‌হাওটা হালকা ক'রে দেন রমেশ ঠাকুর্দা।

এইবার প্রয়াগবাবুর মা তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করার ফুরসৎ পান। বলেন, 'তা বাবা, সবই মানছি। কথাগুলো তোমার একটাও মিথ্যে নয়। তবে আমাদের তো সমাজ মেনে চলতে হয়। তোমার ঐ নগে আর তপনকে যদি আমি নেমন্তন্ন করি—আমার কোন আপত্য নেই, সত্যিই তো, যাদের বলব সকলকারই কি চরিত্তিরের হিসেব রাখছি?—তা তো আর নয়—ওরাই না হয় ধরা পড়ে চোর সেজেছে, বলে ধরা পড়েছে জয় মিত্তির উল্‌টো দিকে কাগজ ধরে—তা নয়, বলি তখন অন্য বামুনরা যদি বলে আমরা খাব না ওদের সঙ্গে—তখন কি করব? আয়োজনটাই তো মাটি। আর নেমন্তন্ন ক'রে এনে কিছু বলা যায় না—তুমি ঘরের মধ্যে এককোণে বসে চুপুচুপু খেয়ে নাও, কেউ না টের পায়।···বলা যাবে কি?'

'হ্যা——।' বলে শব্দটা টেনে উঠে পড়েন রমেশ ঠাকুর্দা, 'না, সে ঠিক। না, না, তোমার মতো ফর্দ তুমি করো খুড়ি—আমার ও পাগলের কথায় কান দিতে হবে না। তাছাড়া আমার না হয় হস্বি-দীঘ্যি জ্ঞান নেই, তাদের তো আছে, তাদের ডাকলেও তারা আসবে না। নাও বাবা লক্ষ্মী-নারায়ণ, ফর্দ করো তোমরা—আমি চলি। হ্যা——!'

॥ ৬ ॥

দেশ থেকে কেন বেরিয়েছিলেন সেটা জানা হলেও কি ক'রে বেরিয়েছিলেন, এত দেশ থাকতে কাশীতেই বা কেন এলেন—সে কথাটা জানা হয়নি অনেকদিন পর্যন্ত। আমরাও নানা কাজে ব্যস্ত থাকি, ইস্কুল আছে, বাজার আছে, দুধ আনা আছে—ওঁরও সকাল বিকেল চাকরি। কোনদিন একটু ফাঁক পেলে কি দরকার থাকলে—মা ইদানীং ব্রত পার্বণে, অক্ষয় তৃতীয়ার ব্রতে ফলমিষ্টি নিতে কি শিবরাত্রির পারণ করাতে ওঁকেই ডাকতেন—তবে আসতেন, সেও সকালের চাকরি শেষ ক'রে, স্নান সেরে আসতেন একেবারে। বড় জোর এইসব দিনগুলোতে সে পর্বটা একটু সকালে সারা হ'ত এই পর্যন্ত। ভবানীদাকে বলে তাঁকে বসিয়ে উনি চলে আসতেন।

কেবল শিবরাত্রির পরের দিন ভোরবেলাই এসে হাজির হতেন। কারণ তিনিও—অত ক্ষিদেকাতুরে মানুষও—নিরম্বু উপোস ক'রে থাকতেন ঐ দিনটায়। সে জন্যেও বটে, মার কথা ভেবেও বটে—স্নান গায়ত্রী সেরে চলে আসতেন সকালবেলাই। অবশ্য, সেদিন সকালে দোকান বন্ধও থাকত বরাবর। এ ছাড়া কোনদিন হয়ত এমনিও মার খবর নিতে আসতেন—বিকেলে দোকানে বেরোবার আগে, 'কী করছ, অ মেয়ে। বলি আজ একটু খবর নে যাই, কাজ তো বারোমাসই আছে —বলে, না কাজ না কামাই, হ্যা— —।'

কিন্তু সেও তো আমাদের ইস্কুলে থাকবার সময়, কদাচিৎ কোন ছুটিটুটির বা হাফ হলিডের দিন ওঁর মর্জির সঙ্গে মিললে তবেই দেখা হ'ত। তাও তখন আড্ডা জমাবার মতো সময় থাকত না।

হঠাৎই একদিন সুযোগটা মিলে গেল।

অন্নপূর্ণা পূজো সেদিন, সুরেশ মুখুজ্জের শাশুড়ির মানসিক ছিল

কাশীতে এসে অন্নপূর্ণা পূজা করবেন। ঘটার পূজো, অনেক লোক খাবে—হালুইকর বামুন আনিয়েছেন সুরেশবাবু কলকাতা থেকে—কিন্তু ভোগ রাঁধার কাজ তাদের দিয়ে হবে না, শাশুড়ীর পছন্দ নয়—ওঁদের বাড়িতেও তেমন কেউ নেই, অগত্যা আমাদের সতীদি ভরসা।

সতীদিরও তাতে কোন আপত্তি নেই। খুব সকালে যেতে হবে, তাও যাবেন। ভোরবেলা উঠে গঙ্গাস্নান ক'রে অন্নপূর্ণার বাড়ি একশো-আটবার ফেরা দিয়ে এসে বুড়োর ব্যবস্থা ক'রে ছটার মধ্যেই সেখানে চলে যাবেন।

বুড়োর ব্যবস্থা করতে হবে—তার কারণ ভোগ সারতে অনেক বেলা—এমনি যজ্ঞির লুচি পৌছে দিয়ে যাবেন সে পথও নেই। সুরেশ মুখুজ্জের বাড়ি সিগ্‌রায়, এ পাড়া থেকে বহুদূর। ঠিক ছটায় ডুলি পাঠাবেন সুরেশবাবু বলে দিয়েছেন। যেখানে যাওয়া-আসার ডুলি ব্যবস্থা, সেখান থেকে খাবার নিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে দিয়ে যাওয়া যায় না, ডুলিভাড়া দেবারও পয়সা নেই। আসা যাওয়ায় অন্ততঃ আটগণ্ডা পয়সা নেবে তারা, সতীদির কাছে কল্পনাতীত বিলাস।

অবশ্য সেদিন খাওয়ার অত চিন্তাও ছিল না। চিন্তার কারণ ছিল অন্য। আগের দিন ঠাকুর্দার সর্দি-জ্বর মতো হয়েছিল, দুধসাবু ক'রে রেখে গেলেই হাঙ্গামা চুকে যাবে—জ্বর যদি ছেড়ে যায়, হয়ত সন্ধ্যের দিকে প্রসাদ খেতে পারবেন, নয়তো আবার এসে সাবুই ক'রে দেবেন সতীদি। তা নয়—ভাবনা 'যদি দিন-মানে জ্বর আরও বাড়ে, যদি বেঁহুশ হয়ে পড়ে ?'

বোধহয় অনেক ভেবেছেন দিদি, সারারাত ঘুমই হয় নি—ভোরবেলা ছুটে এসেছেন আমাদের এখানে—অন্ধকার থাকতে। কাপড় গামছা ফুলের সাজি কমণ্ডলু আর ছোলার পুঁট্‌লি নিয়ে একেবারে গঙ্গার জন্যে প্রস্তুত হয়েই বেরিয়ে এসেছেন। একশো আটবার ফেরা দিতে হবে,

তার গণনা ঠিক রাখার জন্যে একশো আটটা ছোলা গুণে নিয়ে বেরনো—একবার ক'রে ফেরা বা প্রদক্ষিণ শেষ হবে আর একটা ক'রে ছোলা ফেলে দেবেন। জপের মালা আছে কিন্তু এসব বৃথা গণনায় নাকি জপের মালা ব্যবহার করতে নেই—তাই এই ছোলার ব্যবস্থা। তখনকার দিনে এক পয়সায় একপো ছোলা পাওয়া যেত—একশো আটটা ছোলা নষ্ট করার জন্যে কেউ চিন্তা করত না।

'অ মেয়ে, এই একটা কথা বলতে এলুম। বুড়োর তো কাল থেকে জ্বর। সারাদিন থাকব না, তাই বড্ড ভাবনা হচ্ছে। এখন অবিশ্যি ঘুরে আসব একবার, চান ফেরা সেরে এসে সাবুদুধ ক'রে রেখে যাব দু'বারের ম'তো, এখন ছোলা, আদার কুঁচি, নুন, মিছরি একটু, গুছিয়ে রেখে এসেছি মুখ ধুয়ে খাবে—তা নয়, চোপর দিনটা বুড়ো একা পড়ে থাকবে—আমার এই ছোট নাতি যদি একবার একটু দুপুরের দিকে গিয়ে খবর নিত —?··· পারবে না ? আজ তো ইস্কুল নেই ওদের— ?'

খুব করুণ অনুনয়ের ভঙ্গী সতীদির। ওঁর ধারণা এটা খুবই অন্যায় অনুরোধ করা হচ্ছে, সেজন্যে সঙ্কোচের সীমা নেই।

মা বললেন, 'ওমা, তার জন্যে আবার এত কিন্তু হচ্ছেন কেন ? আমি ওদের রান্না সেরে রেখে দর্শনে বেরোব—ফেরা সেরে ফিরতে ধরো বেলা বারোটা—তা আমি এসেই ওকে ছেড়ে দেব। তা'হলেই হবে তো ? তারপর বিকেল অবদি থাকতে পারবে। আমি বরং বাবার জন্যে একটু আলুর টুপোও পাঠিয়ে দো'ব। আগে মাজা কড়ায় করব—ওদের বিকেলে জলখাবারের জন্যে ক'রে রাখব একেবারে—আলু আর ঘি, খেতে তো দোষ নেই— ?'

এ-ই উত্তম সুযোগ। তবু একটু চিন্তা ছিল বুড়োর যদি সত্যিই জ্বর খুব বাড়ে—তা'হলে আমার যা উদ্দেশ্য তা সিদ্ধ হবে না। কিন্তু, গিয়ে দেখলুম—ছটফট করছেন বটে, তবে সে জ্বরে নয়—ক্ষিধেয়। জ্বর তখন

আর নেই। গা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, দুধসাবু যা ছিল—দুবারের মতোই ক'রে রেখে গিয়েছিলেন সতীদি—সে এর মধ্যেই শেষ হয়ে গেছে। আমি যখন গেলুম তখন উনি শিকেয় ঝোলানো হাঁড়ি আর তাকে টিনের কৌটো হাঁটকাচ্ছেন—কোথাও আগের পাওনা কোন বাসি মিষ্টি পড়ে আছে কি না।

এই অবস্থায় আলুর টুপো পেয়ে যেন বেঁচে গেলেন। আলুর টুপোর সঙ্গে মা একটা সন্দেশও দিয়েছিলেন—বলতে গেলে গোগ্রাসে গিলে এক ঘটি জল খেয়ে—একটা সশব্দ উদ্গার তুলে খুশী মনে গিয়ে তামাক ধরাতে বসলেন। লম্প জ্বেলে একখানা টিকে ধরিয়ে দেওয়া—এইটুকু কাজ—বাকী যা, ক'ল্কে সাজানো তাও সেরে রেখে গেছেন সতীদি। বোধহয় রাত্রিবেলা শুতে যাওয়ার আগেই চারটে ক'ল্কে সাজিয়ে রেখেছিলেন।

তামাক ধরিয়ে হুঁকো নিয়ে তাঁর অভ্যস্ত জলচৌকিটিতে বসতেই আমি চেপে ধরলুম, 'আচ্ছা ঠাকুর্দা—আপনি বাড়ি থেকে চলে এলেন কেন, পূজো করবেন না করবেন না—ওখানে থেকে অন্য একটা চাকরি-বাকরিও তো দেখতে পারতেন। আর পালিয়ে কাশীতেই বা এলেন কেন?'

ঠাকুর্দা তাঁর সেই প্রায়-অস্তিত্বহীন ক্ষুদ্র চোখ দুটিকে যতদূর সম্ভব তীক্ষ্ণ ক'রে আমার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, 'কেন বল্ দিকি তোর এত চোদ্দগুষ্টির নিকেশ নেওয়া?···বলি আমাকে দিয়ে নবেল লিখবি না কি?—আ মর,—কেন, কি বিত্তান্ত, চোদ্দ ঝুড়ি কৈফেৎ—জ্বালিয়ে খায় ছোঁড়া।'

'আহা, বলুনই না বাবা।···একটু না হয় জানতেই ইচ্ছে হয়েছে। তাতে কোন দোষ তো নেই!'

'দোষ! দোষ আবার কি?' ঠাকুর্দা যেন জলে ওঠেন একেবারে, 'চুরিও করি নি, দারিও করি নি—কাউকে খুন ক'রে কি কারও পরিবার নিয়ে পালিয়েও আসি নি। যা করেছি সাফ সাফ বলতে পারি—মরবার

পর যমরাজের সামনে দাঁড়িয়েও কবুল করতে পারি নিশ্চিন্তি হয়ে।'

তারপর চুপ ক'রে বসে খানিকক্ষণ তামাক টেনে কল্‌কেটা একটু ঘুরিয়ে ভাল ক'রে হুঁকোর মুখে চেপে বসিয়ে বললেন, 'কি শুনতে চাস কি ? বাড়ি থেকে কেন চলে এলুম ?—পূজো করব না বলার পর আমার কি অবস্থা হ'ল বাড়িতে তা তোরা ভাবতেও পারবি নি। মা থেকে জ্যাঠাইমা থেকে ভাইবোন—কেউ আর লাঞ্ছনার বাকী রাখল না। লেখাপড়া শিখি নি যে চাকরি করব। পূজোর ব্যাপার তো চুকেই গেল—তা'হলে করব কি ? বাবা রাগ ক'রে বললেন, "তাহলে মার কাছে হাঁড়ি-বেড়ি ধরতে শেখো—ন চ বিগ্বে উনুনে ফুঁ—লোকের বাড়ি ভাত রেঁধে খাও গে !" মামারা পরামর্শ দিলেন চাষবাস দেখতে—একটা তো কিছু করতে হবে।

'ইরি মধ্যে, বোধ হয় কারও পরামর্শতেই, বাবা এক ফন্দী আঁটলেন। হঠাৎ শুনলুম, মেয়ে দেখা হচ্ছে, আমার বে দেবেন এবার। একদিন দুদিন দেখলুমও, ছাতা বগলে ক'রে আমাদের থেকেও দীন অবস্থার লোক সব বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসে হাতজোড় ক'রে বসে থাকছে। প্রেথমটা একটু অবাকই হয়েছিলুম, মতলবটা অত বুঝতে পারি নি। পরে বুঝলুম, বুদ্ধিটা এঁটেছে আমাকে ফাঁদে ফেলে জব্দ করার জন্যে। ঘাড়ে একটা সংসার চেপে বসলে, দু'চারটে বাচ্ছা হয়ে গেলে তখন আর পথ পাবো না, ফেলা থুতু চেটে খেয়ে আবার সেই ঘণ্টা নাড়তে বেরোতে হবে।

'তখনই বুঝলুম যে আর নয়—এবার পথ দেখতে হবে। তবু অত যে তাড়া তা বুঝি নি—যেদিন বাবা বললেন, "আজ বিকেলে কোথাও যাস নি, বোড়াল থেকে দেখতে আসবেন এক ভদ্দরলোকেরা।" সেদিনই বুঝলুম যে বাপের অন্ন এবার উঠল। নিশ্চয়ই আগে কথাবার্তা যা হবার হয়ে গেছে—ছেলে দেখে পাকা ক'রে যাবেন তাঁরা। সেদিনটা আর বাবাকে ব্যাভ্রমে ফেলি নি, পরের দিন ভোর বেলাই চাংড়িপোতায় এক

বন্ধুর বাড়ি যাচ্ছি বলে বেরিয়ে পডলুম—এক কাপড়ে, সঙ্গে সম্বলের মধ্যে ঐ আগে যে কদিন যজমানি করেছি তার দরুন জমা পাঁচটি টাকা।'

একটু থেমে অকারণেই যেন একটু অপ্রতিভের হাসি হেসে গল্পের খেই ধরলেন আবার। একটানা হেঁটে বেলা দশটা নাগাদ কলকাতা পৌছলেন। একটা ব্যবস্থা ঠিকই ছিল ওঁর। এক বন্ধুর মামার ছাপাখানা ছিল গরানহাটা অঞ্চলে, সেই ঠিকানাটা লিখে নিয়েছিলেন আগের দিন। খুঁজে খুঁজে বারও করলেন ভদ্দরলোককে—পরিচয় দিয়ে বললেন, 'আমি ছাপাখানায় কাজ শিখতে চাই, যদি দয়া ক'রে একটা ব্যবস্থা ক'রে দেন। মাইনে পত্তর চাই না এখন, একটা জীবন-ধারনের মতো ব্যবস্থা হ'লেই হবে।'

তিনি হাসলেন শুনে 'যদ্দিন কাজ না শিখছ তদ্দিন ও ব্যবস্থাটা কি ক'রে হবে ?···তুমি কিছুই জানো না, তোমার টাইপ-কেস চিনতেই তো একমাস লাগবে। কাজ কিছু পেলে তবে খোরাকী দেওয়ার কথা ভাবা যায়। এখন তোমাকে কে চালাবে ? তুমি বলছ রাখালের বন্ধু। কাজ শেখার ব্যবস্থা এখানে করতে পারি—এদের বলে-কয়ে দিলে বিশেষ ক'রে হয়তো শেখাবেও, নইলে এমনি শালারা কিছুতে শেখাতে চায় না, নিজেদের মেগের ভাইদের জন্যে রেখে দেয় বিদ্যেটা—কিন্তু থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা তোমার নিজের।'

'বুঝতেই পারছ আমার অবস্থা।' বললেন ঠাকুর্দা, 'সম্বল তো ঐ পাঁচটি টাকা। তবু ভয়ে ভয়ে বলতে গেলুম, 'এখানে থাকার একটু বন্দোবস্ত হ'তে পারে না ? খাওয়াটা না হয় বাইরে বাইরে সারলুম।' তিনি বেশ উঁচুদরের হাসি হেসে বললেন, "তার কম আর নেশা জমবে কেন ? প্রেস ঘরে তোমাকে রেখে যাই আর তুমি রোজ এক এক মুঠো টাইপ চুরি ক রে বেচে খাও!···চিনি না শুনি না, সত্যিই তুমি রাখালের বন্ধু কিনা তাও জানি না। আর তা হ'লেই বা কি, আজকালকার দিনে নিজের ছেলেকেই

বিশ্বাস নেই—তা ভাগ্নের বন্ধু। ওসব হবে না বাবা—সরে পড়ো। বলছ তো বামুনের ছেলে, চেহারা দেখে তো মনে হয় না" !'

খুবই অপমান লাগল ঠাকুর্দার। অতটা হেঁটে এসেছেন, সারাদিন খাওয়া হয় নি কিছু—পথে এক জায়গায় এক পয়সার মুড়ি-বাতাসা আর কলকাতায় পৌঁছে একটা দোকান থেকে চার পয়সার লুচি, খাওয়ার মধ্যে এই—সব জড়িয়ে চোখে জল এসে গেল। সেখান থেকে বেরিয়ে গেলেন একেবারে হাওড়া ইষ্টিশান।...

'বলবি এত জায়গা থাকতে ওখেনে কেন ? ঐ নামটাই শোনা ছিল, কলকেতার আর কিছুই তো জানি না—ক'টা পাড়ার নাম জানতুম শুধু। তা কোন চেনা লোক না থাকলে সেখানে গিয়েই বা লাভ কি ?...তাছাড়া শরীরটা কোনদিনই ভাল ছিল না। ছোটবেলায় ম্যালেরিয়া আর আমাশায় ভুগে ভুগে দেহ ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল। শুনেছিলুম পশ্চিমের জলহাওয়া ভাল—তাই ঐ দিকেই ঝোঁকটা ছিল খুব।'

হাওড়ায় তো পৌঁছলেন, এখন যান কোথায় ? হাতে তো ছিল পাঁচটি টাকা। তারও তো দুগণ্ডা পয়সা খরচ হয়ে গেছে এর মধ্যেই। অন্তত টাকা খানেক রাখতে হবে। টিকিটের খোপের কাছে গিয়ে শুধুলেন, 'তিন টাকা সাড়ে তিন টাকার মধ্যে কোথায় যাওয়া যায় বলতে পারেন—পশ্চিমের দিকে ?' সে বাবুটি আবার রসিক খুব—চোখ টিপে বললেন, 'বাড়ি থেকে পালাচ্ছ বুঝি ছোকরা ? তা যাও, মাস ছয়েক বড় জোর—আবার সুড় সুড় ক'রে ফিরে এসে বাপের হোটেলে সেঁধুতে হবে। বাবুরা ভাবেন পশ্চিমে ওঁদের জন্যে সব ডালায় ক'রে চাকরি সাজিয়ে নিয়ে বসে আছে—গেলেই টুলে বসতে পারবে।...হবে, টিকিট হবে বৈকি। পাটনা হবে, গয়া হবে, ভগলপুর। কোনটা চাই, কোনটা পছন্দ বলে ফ্যালো।'

কী মনে হ'ল, ঠাকুর্দা ফট ক'রে বলে বসলেন পাটনা। শুনলেন

তখনই একটা গাড়ি আছে, রাত সাড়ে নটায়। ভোর বেলায় পাটনায় পৌঁছে যায়। টিকিটবাবুই দয়া ক'রে বলে দিলেন, 'বাঁকীপুরের টিকিট দিলুম—ঐটেই শহর। ফট্ ক'রে যেন পাটনা সিটিতে নেমে পড়ো না। ওখানে কিছু নেই—একটা বাঙালীরও দেখা পাবে না।'

'কিন্তু বাঁকীপুরই বা কি পাটনাই বা কি—আমার কাছে সব সমান!' ঠাকুর্দা হেসে বললেন 'কে-ই বা আছে আমার। কত লোকের কত আত্মীয় থাকে, পশ্চিমে ভাল ভাল চাকরি করে, ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি—আমার কেউ কোথাও নেই।

'বাঁকীপুরে তো নামলুম—সেখানেও কলকেতারই অবস্থা। কে আমার মাসীর মার কুটুম আছে সেখানে—যার কাছে গে দাঁড়াব। টিকিটবাবুর কথায় রাগ করেছিলুম বটে,—পাটনায় নেমে দেখলুম সে অলেহ্য কিছু বলে নি। চাকরি বললেই কিছু চাকরি মেলে না। তা ছাড়া —একটা কথা আগে ভেবে দেখি নি—একমাস চাকরি করলে তবে মাইনে হাতে আসবে, এই একমাস খাব কি? মরুক গে—গতস্য শোচনা নাস্তি, তখন আর আপসোস ক'রে লাভ কি বল। ইষ্টিশানে নেমে সারা দিন টো টো ক'রে ঘুরলুম শহরে, পকেটে একটা টাকা আর কটা পয়সা মাত্তর ছিল। গঙ্গায় গিয়ে মুখহাত ধুয়ে সন্ধ্যে সেরে একটা দোকানে গিয়ে একটু জলখাবার খেলুম। ছাতু খেতে পারলে হ'ত—অনেক কম খরচায় পেটটা ভরত—সাহস হ'ল না। পেটরোগা চিরকাল। এমনিই তো পেটে ভাত নেই পুরো একদিন—শেষে ছাতু খেয়ে যদি পেট ছাড়ে? পথে পড়ে বেঘোরে মরতে হবে।'

ঘুরলেন অনেক। বাঙালী পাড়া কোথায় খোঁজ ক'রে ক'রে গেলেনও দুচারজন ভদ্র লোকের বাড়ি। বেশ সম্ভ্রান্ত লোক সব, ভাল ভাল চাকরি করেন—সবাই এক রকম দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দিলেন। তবে তাঁদেরও বিশেষ দোষ নেই, তখন ওঁর খুব দুঃখ হয়েছিল বটে—পরে

বুঝেছেন কোন অন্যায় করে নি তারা।

'এমন বিস্তর ঠকেছে ওখানকার বাঙালীরা, এই ধরণের বাপে-তাড়ানো মায়ে-খেদানো ছোকরাদের চাকরি দিয়ে। আপিসে মুখ পুড়েছে—খাকৃতাইয়ের একশেষ। বেশির ভাগই দুচার দিন কাজ ক'রে দুচার জনের টাকা মেরে সরে পড়ে—খেটে খেতে চায় না। কে চোর কে জোচ্চোর —অত কে বুঝছে বলো? "অজ্ঞাত কুলশীলস্য বাসং দেয়ং ন কস্যচিৎ"—এই মন্তরই ভাল। আর আমার তখন যা চেহারা—এক কাপড় এক জামা —আগেই আধময়লা ছিল—দুদিনে রেলের কালিতে ধুলোতে ভিখিরির অধম হয়েছে পোশাকের অবস্থা—তার ওপর চেহারা তো এই লোহার কাত্তিক—আমাকে দেখে কে ভদ্দর লোক বামুনের ছেলে ভাববে বলো?' বলে হ্যা-হ্যা করে হেসে নিলেন একবার।

তবু ঘোরা ছাড়া উপায়ও নেই। কোনমতে পা দুটো টেনে টেনে হাঁটতে লাগলেন। কিন্তু সারাদিন ঘুরতে ঘুরতে সন্ধ্যে হ'ল যখন তখন আর হাঁটবার অবস্থা নেই। আগের দিন ভোর থেকে ক্রমাগত হাঁটছেন —পা আর কত সয়! তার ওপর পেটে কিছু নেই—সকালের সেই সামান্য জলখাবার কখন শেষ হয়ে গেছে। একটা কোন পাত্র থাকলে দুটো চিঁড়ে কিনে ভিজিয়ে খেতে পারতেন, তাতে কিছুক্ষণ তবু বোঝা যেত—সে ব্যবস্থাও কিছু ছিল না। একটা গামছা কি কাপড় নেই যে স্নান করেন—তখন ওর মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে করছে। সবচেয়ে কষ্ট ক্ষিধের, পেটে যেন মোচড় দিচ্ছে কে। এক একবার ভেবেছেন যা আছে সঙ্গে —পেটভরে কচুরি জিলিপি খেয়ে নেন—তারপর সোজা গিয়ে গঙ্গায় গা-ঢালা দেবেন।...তখন যদি ফিরে যাবার গাড়িভাড়া থাকত তো ফিরেই যেতেন—গিয়ে বাবার পায়ে ধরে মাপ চেয়ে যজমানির কাজ শুরু করতেন!

'এই যখন মনের ভাব—তখন হঠাৎ লুচির গন্ধ নাকে এল। চারদিকে চেয়ে দেখি একটা বাড়িতে খুব আলো, লোকের ভীড়। ওদেশের ঢাক

কাঁশির বাজনাও বাজছে একটা। আন্দাজে বুঝলুম বে'বাড়ি। আর একটু এগিয়ে দেখলুম বাঙালীরই বে'বাড়ি, নেমন্তন্নে লোক যারা শামিয়ানার নিচে বসেছে তার বেশির ভাগই বাঙালী। ওরই মধ্যে একটু জাঁকের বিয়ে—অনেক লোকজন, বেশ অবস্থাপন্ন—খানকতক বাড়ির পেরাইভেট টমটম ল্যাণ্ডো ফিটনও এসে জমেছে!'

দেখতে দেখতে কখন এগিয়ে গেছেন টের পান নি—চুম্বকে যেমন করে লোহা টানে তেমনি ক'রেই টেনে নিয়ে গেছে ওঁকে লুচির গন্ধ। লোভ দুর্জয়, সেই সময়টায় বোধ হয় একব্যাচ লোক বসছে—হুড়মুড় ক'রে লোক ঢুকছে বাড়ির মধ্যে—একজন সিঁড়ির মুখে হাত জোড় ক'রে দাঁড়িয়ে বলছে "ব্রাহ্মণ-মশাইরা দয়া ক'রে ডান দিকের ছাদে যাবেন, বাহ্‌মন লোক কৃপা করকে ডাহিনা তরফ জানা।" ওঁর মনে হ'ল চলেই যান, এই ভীড়ের মধ্যে গিয়ে এক কোণে বসলে কে আর লক্ষ্য করবে!

একটু হেসে বললেন, 'গিয়েছিলুমও এগিয়ে দোরের কাছাকাছি—কিন্তু ঠিক পাশের দু'একজন একটু অবাক হয়ে চাইতেই—বিশেষ একজন খোশবো-দেওয়া-রুমাল বার ক'রে নাকে দিতে চৈতন্য হ'ল। এ আমি করছি কি। এঁ যা বেশভূষা, যা নিশ্চয় দু'দিনে ঘেমো-গন্ধও হয়েছে জামায়—এ দেখে কেউ নেমন্তন্নে বলে ভুল করবে না! সেখানে পংক্তিতে বসার পর কেউ যদি জেরা করে —বা কান ধরে তুলে দেয়—কিছু বলতে পারব না। দু চার ঘা মার দেওয়াও আশ্চর্য নয়। এক পাত লুচি খেলেই তো আর সব সমিস্যের অবসান হচ্ছে না। কী দরকার মিছিমিছি বেইজ্জত হবার, ইচ্ছে ক'রে লাঞ্ছনার মধ্যে যাওয়ার!'

সঙ্গে সঙ্গেই পিছন ফিরেছেন, বাড়ির মালিক যিনি—যিনি এতক্ষণ দরজার কাছে হাত জোড় ক'রে দাঁড়িয়ে অভ্যাগতদের অভ্যর্থনা জানাচ্ছিলেন—চট ক'রে এসে পথ জোড়া ক'রে দাঁড়ালেন, 'কী, ফিরে যাচ্ছেন যে?'

উনিও তখন মরীয়া, টনটনে জ্ঞান ফিরে এসেছে—সোজা সত্যিই জবাব দিলেন, 'আমার এখানে নেমন্তন্ন হয় নি।'

'তবে ভেতরে যাচ্ছিলেন কেন?'—চারিদিকে ততক্ষণ তু-একজন ক'রে বেশ ক'জন লোক জমে গেছে। সকলেরই মুখে চোখে "মজা"র আনন্দ। কে একজন পেছন থেকে বললে, 'ব্যাটা চোর নিশ্চয়ই, পকেট-মার। কর্ম্ম-বাড়িতে এরকম তু-চারটে জুটবেই—আমি কিছুদিন থেকেই দেখছি। ভীড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে হাত-সাফাই করে।' ঠাকুর্দার কান-মাথা গরম হয়ে উঠল, তবু সোজা মালিকের চোখের দিকে চেয়ে বললেন, 'সারাদিন খাওয়া হয় নি—খিদেয় খুব কষ্ট হচ্ছিল তাই প্রেথমটা লোভ সামলাতে পারি নি—ভীড়ে মিশে ভেতরে যাচ্ছিলুম, যদি এক কোণে বসে খেতে পারি।' বাড়ির মালিক কিন্তু—পরে শুনেছিলেন মেয়ের জ্যাঠামশাই—তিনি ওঁর মতোই শান্তভাবে কথা বলছিলেন তখনও, বললেন, 'তা গেলেন না কেন?' উনিও সেই সুরে জবাব দিলেন, 'এখনও মাথাটা একেবারে খারাপ হয়ে যায় নি—ভগবানও বাঁচিয়ে দিলেন কতকটা—নইলে হয়ত লুচির বদলে মার খেতে হ'ত। এই পোশাকে যজ্ঞি-বাড়ি ঢোকা যায় না। যিনি পকেটমার বলছেন তিনি কিছু অন্যায় বলেন নি। তবে—এইভাবে যারা যজ্ঞি-বাড়িতে চুরি করতে আসে—তারা পোশাক-আশাকটা ভাল ক'রেই আসে—নেমন্তন্নে লোকের মতোই।'

বাড়ির কর্তা এবার হাসলেন একটু, বললেন, 'বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছেন বুঝি? বাড়ি কোথায়? কী জাত আপনারা?' ঠাকুর্দা সংক্ষেপেই উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, পালিয়ে এসেছি, সকাল থেকে ঘুরছি এখানে—কাল কলকাতাতেও ঘুরেছি—কোথাও কোন কাজ-কর্ম্মের ব্যবস্থা হয় নি, আশ্রয়ও না। পকেটে একটা টাকা আছে এখনও, জামাকাপড় এই যা গায়ে আছে! কোথাও কিছু যদি না হয় গঙ্গায় গিয়ে উলতে হবে। জাতে ব্রাহ্মণ—'সেটা প্রমাণ করবার জন্যে পিরানের মধ্যে থেকে পৈতাটাও

বার ক'রে দেখালেন—কথা শেষ ক'রে হাত জোড় ক'রে বললেন, 'দয়া ক'রে আমাকে আর আপনি-আজ্ঞে বলে লজ্জা দেবেন না—এমনিই ঢের লজ্জা পেয়েছি। আপনি শালা-উল্লুক করলে কি দু'ঘা জুতো মারলে এতটা পেতুম না বোধহয়।'

বোধকরি এই স্পষ্ট অথচ বিনত ভাষণেই নরম হয়ে এল ভদ্রলোকের চোখ। বললেন, 'ঠিক আছে, তুমি গিয়ে বসে পড়োগে, খাওয়া-দাওয়া করো, তারপর ভেবে দেখব কি করা যায়।'

উনি বললেন, 'আজ্ঞে, তা পারব না। অজান্তে অজ্ঞানের মতো যা করতে যাচ্ছিলুম,—এখন আর তা সম্ভব নয়। এই জামাকাপড় পরে ওঁদের পাশে গে বসতে পারব না।'

তিনিও তেমনি, বললেন, 'আমি বলে দিচ্ছি ওরই মধ্যে এককোণে তোমাকে বসিয়ে দেবে। একটু চোখকান বুজে খেয়েই নাও। যজ্ঞি-বাড়িতে আলাদা বসানো বড় ঝঞ্ঝাট, জোটেও না সব জিনিস। আর এরপর খেতে গেলে বেশ রাত হয়ে যাবে। তোমার সারাদিন খাওয়া হয় নি—বসে যাও এই বেলা।······এই পরমানন্দ—এই ছেলেটিকে নিয়ে গিয়ে বামুনদের দিকে এককোণে বসিয়ে দাওতো—কেউ জিজ্ঞেস করলে বলো আমার জানাশোনা, আমি পাঠিয়েছি।'

একটু চুপ ক'রে গেলেন ঠাকুর্দা। চোখ দুটো ছলছল করছে, বোধহয় সেই ভদ্রলোকের কথা মনে হয়েই। খানিকক্ষণ মৌন থেকে একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে আবার শুরু করলেন, 'সে-ই আশ্রয় জুটল। কী বলব ভাই —ভদ্দর লোকের নাম নিতাইবাবু, নিত্যানন্দ—অমন মানুষ আমার এই এত বছর বয়সে আর একটিও দেখলুম না। দেবতা বললেও ওঁকে ছোট করা হয়। এমন স্নেহ—এমন বিবেচনা—এমন সাহস—সাহস ইচ্ছে ক'রেই বলছি, অনেক সময় কাউকে দয়া করতে গেলে রীতিমতো সাহসের দরকার হয়ে পড়ে—আর কারও ভেতর দেখি নি।···অতলোক, অত ভীড়,

কাজের বাড়ি, উনিই বাড়ির কর্তা—কিন্তু খেয়ে এসে বাইরে যে এককোণে ঘাড় বসে ছিলুম নজর এড়ায় নি।...তার মধ্যেই বাড়তি ধুতি-গামছার ব্যবস্থা করলেন, ভেতর থেকে একটা খাটিয়া আনিয়ে সেদিনের মতো শামিয়ানার নিচেই একপাশে শোওয়ার ব্যবস্থা হ'ল—তার পরের দিন সকালে উঠে কোথায় মুখ-হাত ধোব, কোথায় কি করব—সেসব বাতলে দিয়ে তবে ভেতরে নিজে খেতে গেলেন।'

এই ভাবে অপ্রত্যাশিত একটা আশ্রয় মিলল। পরের দিন নিতাই-বাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি জান? কতদূর পড়েছ?' উনিও সোজা উত্তর দিলেন, 'সামান্য কিছু সংস্কৃত পড়েছি, ইংরেজী নাম-মাত্তর।' নিতাইবাবু সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা করলেন বাড়িতে যে দুটি ভাইপো-ভাইঝি আর তাঁর একটি নাতি আছে তাদের বাংলা পড়াবেন, ওঁর বাড়ি খাওয়া থাকার ব্যবস্থা করে দেবেন তার বদলে। তার বেশী যা দরকার নিজেকে রোজগার ক'রে নিতে হবে। তবে এও বলে দিলেন যে বাংলা পড়ানোর টিউশানি এখানে অনেক জুটবে—দু-টাকা এক টাকা মাইনের, তাতে বাকী খরচ চলেই যাবে, তবে চাকরির বিশেষ সুবিধে হবে বলে মনে হয় না।

'জুটলও কটা ছাত্তর আরও। পড়ানো মানে অ-আ-ক-খ, দ্বিতীয় ভাগ, বোধোদয় পর্যন্ত দৌড়। আমার কোন কষ্টই নেই। নিতাইবাবুর বাড়ির যে তিনটি—সেও ঐরকমই, বোধোদয় আখ্যানমঞ্জরী, পদ্যপাঠ। হাতের লেখা লেখানোই কঠিন কাজ ছিল, তা তখন—বললে বিশ্বাস করবি না—হাতের লেখা আমার খুব ভাল ছিল, মুক্তোর মতো।'

অর্থাৎ ঠাকুর্দার এমনি অভাব বিশেষ কিছু আর রইল না। বাড়তি যা রোজগার হ'ত ছ'সাত টাকার মতো, তাতেই হাতখরচ চলে যেত—জামা-কাপড় সুদ্ধ। কীই বা দাম ছিল তখন। তাছাড়া, নিতাইবাবু মুখেই খাওয়া-থাকা বলেছিলেন—কাজে জামা কাপড় সবই আসতে লাগল, নানা ছুতোয়। সেকালে বার-ব্রত বাঙ্গালীর ঘরে লেগেই

থাকত, জামা কাপড় ছাতা-জুতো দেওয়ার কারণের অভাব হ'ত না। খাওয়া-জল খাবারের তো কথাই নেই। আধ সের ক'রে দুধই খেতেন রোজ—ক'মাসে মোটা হয়ে গিছলেন।

'কিন্তু' ঠাকুর্দা বললেন, 'মন মোটে টিকল না ওখানে। পশ্চিম পশ্চিম শোনা ছিল, ভাবতুম না জানি কি—মনে মনে একটা ছবিও এঁকে নিয়েছিলুম। তার সঙ্গে কিছুই মিলল না। ধুলোর শহর, সরু সরু রাস্তা—সবচেয়ে বড় রাস্তা যেটা কলকাতার গলির মতো,—অতখানি শহর জুড়ে গঙ্গা বইছে তাতে একটা বাঁধা ঘাট নেই কোথাও। তবু পড়ে ছিলুম কাদায় গুণ ফেলে—নিতাইবাবুর টানেই আরও—হঠাৎ ওদের সংসারে একটা ওলট্ পালট্ হয়ে গেল। আমারই অদেষ্ট, নিতাইবাবু চাকরি-বাকরি ছেড়ে হরিদ্বার চলে গেলেন, সন্নিসীর মতো সেখানে থাকবেন একা। উনি থাকবেন না আমি ওখানে থাকব, অত যত্নের পর কুপুষ্যির মতো থাকা—সে আমার ধাতে পোষাল না, আমিও সেই ফাঁকে সরে পড়লুম।'

অনেকক্ষণ একটানা বকে ঠাকুর্দা থকে গিছলেন। উঠে বাইরে গিয়ে মুখে-চোখে জল দিয়ে এলেন। এক ঘটি জল খেলেনও ঢকঢক করে—তারপরে আবার লম্প জ্বেলে টিকে ধরাতে বসলেন।

আমি ধমক খাবার ভয়ে চুপ ক'রে ছিলুম এতক্ষণ। এবার হুঁকোয় বারকতক টান দেবার পর ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, 'তারপর ?'

'তারপর আর কি, এতদিনে কিছু টাকাও তো হাতে জমেছিল। সোজা পাঞ্জাব মেলে চড়ে বসে চলে গেলাম লাখনাউ। এবার অবস্থা ভাল, কোমরের জোর আছে, একটা ধর্মশালায় গিয়ে উঠে কাজকর্ম খুঁজতে লাগলুম। পেয়েও গেলুম একটা কাজ।…কিন্তু সেখানেও বেশীদিন টিকতে পারলুম না। সেখান থেকে সোজা এই কাশী।'

একটু যেন অতি-সংক্ষেপেই কাহিনীতে ছেদ টানলেন এবার।

আমি আর একটু সাহসে ভর ক'রে প্রশ্ন করলুম, 'ওখানে টিকতে পারলেন না কেন ?' ঠাকুর্দা কিন্তু খুব একটা ঝোঁঝে উঠলেন না, নরম গলাতেই বললেন, 'সে ভাই তোকে বলতে পারব না। অন্তত এখন নয়। সে বয়স এখনও তোর হয় নি।'

॥ ৭ ॥

সেদিন না বললেও গল্পটা শেষ পর্যন্ত একদিন বলেছিলেন রমেশ ঠাকুর্দা। অনেক পীড়াপীড়িতে সঙ্কোচটা কাটিয়ে উঠেছিলেন।

অবশ্য গল্প তো এটা নয়। তাঁর জীবনেরই অভিজ্ঞতা। জীবন-কাহিনীরও অঙ্গ বলা যায়। সত্য ঘটনাই—অন্তত তাঁর যতটা জানা আর শোনা। তবু, বলতে লজ্জা হয়, সহজে বলেন না কাউকে।

ঠাকুর্দা পাটনাতে এসে নেমেছিলেন কপর্দক-শূন্য অবস্থায় কিন্তু পাটনা ছাড়ার সময় ঠিক সে অবস্থা ছিল না, ট্যাঁকে কিছু 'রেস্ত' (এটা ঠাকুর্দারই ভাষা, বলা বাহুল্য) নিয়েই বেরিয়েছিলেন।

তবু, সে কিছু কুবেরের ঐশ্বর্য নয়। গাড়ি ভাড়া বাদে হাতে বোধহয় পনেরো-ষোল টাকা ছিল, খুব বেশী হ'লেও দু'মাসের খরচ। ধর্মশালায় উঠেছিলেন বটে, তবে সে বড় নোংরা, আর সেখানে বেশী দিন থাকতেও দেবে না। ঘর একখানা ভাড়া করতে গেলে—তাতেও কোন না মাসে একটা টাকা ক'রে বেরিয়ে যাবে।

সুতরাং চাকরী খুঁজতে বেরোতে হয়েছিল।

চাকরী আর কি, এমন ভাল ইংরেজী জানেন না যাতে কোন আপিসে চাকরি হয়। জানেন বাংলা আর কিছু সংস্কৃত, তাতে এক বাঙ্গালীবাড়ি টিউশ্যানী করা যায়—ছোট ছেলে-মেয়েদের পড়ানো। তখন এত বাংলা ইস্কুল হয় নি, ওটার খুব দরকার ছিল।

সেই কাজই খুঁজতে ডাক্তার বাগচীর বাড়ি গিছলেন, বাড়ি নয় অবশ্য, ডাক্তারখানায়। বাঙ্গালী নাম দেখে ঢুকেছিলেন, ডাক্তার খুব রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। আসলে তাঁর ছেলেপুলেও ছিল না—কিন্তু ঠিক সেকথা বলে তাড়ান নি, অকারণে অনেক কটু কথা বলেছিলেন। খিঁচিয়ে উঠেছিলেন বলতে গেলে। এখন বোঝেন রমেশ ঠাকুর্দা যে—মন ভাল ছিল না বলেই বলেছিলেন। জ্বালাটা প্রকাশের পথ্ খুঁজছিল, হাতের কাছে যাকে পেয়েছে তার ওপরই গিয়ে পড়েছে।

পরের দিনও কাজের খোঁজ অমনি বাঙ্গালী-প্রধান পাড়ায় ঘুরছেন, হঠাৎ সেই ডাক্তারটির সঙ্গে দেখা। খুবই সুপুরুষ চেহারা, দীর্ঘ দেহ, গৌর বর্ণ—বাঙ্গালী নয়, দেখলে পাঠান বলেই মনে হয়। চেহারাটার জন্যেই মনে ছিল আরও, দেখেই চিনতে পেরেছেন ঠাকুর্দা।

কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত ভাবেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিলেন, কোন উদ্দেশ্য নিয়ে যে তাকাচ্ছেন তাও মনে হ'ল না—বাড়িতে থাকার জো নেই বলেই বেরিয়ে পড়েছেন—কতকটা সেই অবস্থা। হঠাৎ নজর পড়ল ওঁর দিকে। বেশ উদ্ধতভাবেই বললেন, 'ওহে ছোকরা—শোন! কাল তুমি চাকরী খুঁজতে গিছলে না? কিসের চাকরী? কি জান? লেখাপড়া তো শেখ নি।······রাঁধতে জানো? ভাত রাঁধতে? পিরানের মধ্যে থেকে তো পৈতে বেরিয়ে আছে দেখছি।···বামুন তো? ভাত রাঁধবে আমার এখানে?'

এই বলে—ঠাকুর্দার উত্তরের অপেক্ষা না ক'রেই বলে গেলেন, 'ভয় নেই, গুষ্টিবগ্গের রান্না করতে হবে না। সে আমার মহারাজ আছে একজন, মহারাজ মাহারিণ নৌকর—লোকের অভাব নেই, মুশকিল হয়েছে আমার শাশুড়িকে নিয়ে। তিনি আবার হিন্দুস্থানী বামুনদের হাতে খেতে চান না, বলেন, ওরা স্যেৎখানায় গিয়ে কাপড় কাচে না—ওদের হাতে খাব না। অসুবিধে কিছু হয় নি এতদিন—নিজের রান্না

নিজেই ক'রে নিতেন—হঠাৎ অসুখে পড়েই মুশকিল হয়েছে, অথচ এমন ব্যামো নয় যে ভাত বন্ধ হবে, বাতেই শয্যাগত, মাহারিণটা খুব ভালো, দেখাশুনো করে—কিন্তু রান্না তো চলবে না তার দ্বারা, শুধু ওঁর মতো—ভাত, ডাল আর একটা দুটো ভাজাভুজি ক'রে দিলেই হবে। ছাখো পারবে? না পারো—মানে না জানো, সে না হয় আমার মহারাজ দেখিয়ে দেবে—তুমি খুন্তি নাড়লেই হ'ল।'

রমেশ ঠাকুর্দার কি মনে হ'ল, বললেন,—'ভাতটা হয়ত নামাতে পারব—ডালটাও, ভাজাও এমন কিছু কঠিন নয়—হয়ত চেষ্টা করলে পারব—তবে আটা-ময়দার পাট কিছু জানি না।'

'কিছু না, কিছু না, কিচ্ছু দরকার [illegible]। রাত্রে পুরী খান—সে আমার মহারাজই ক'রে দেয়। লুচি-পুর[illegible] হাতে চলে। শুধু ডাল ভাতেই নাকি যত ওঁর জাত বাঁধা আছে—তার জন্যে বাঙালী বামুন চাই। তাহ'লে পারবে তো? কেমন লোক তুমি—চোর কি ছ্যাঁচোড় কিছুই জানি না—কিন্তু অত খোঁজ নেবার আমার সময়ও নেই এখন,—যাও, যাও, কোথায় কাপড-জামা কি আছে নিয়ে এসো গে। তোফা থাকবে, তোমার রাত্তিরের খাবারও মহারাজ ক'রে দেবে—মছলীও যেদিন মিলবে—এই হেঁসেল থেকে পাবে। খাওয়া-থাকা, তাছাড়া মাইনেও দোব কিছু। আর আমি অন্য লোক পেয়ে যাই এর ভেতর—তোমাকে ভাসিয়েও দোব না তা বলে। তুমি এখানে খেয়ে থেকে টিউশানী ফিউশানী কি কোন কাজকর্ম যোগাড় ক'রে নিতে পারবে।'

রমেশ ঠাকুর্দা একবার ভয়ে ভয়ে বলতে গিছলেন, 'আমাকে কম্পাউণ্ডারীটা শেখাবার একটা ব্যবস্থা ক'রে দেবেন—তখন?'

'উঁহু' সাফ জবাব দিয়েছিলেন ডাঃ বাগচী, 'উটি মাপ করতে হবে। বাঙালীকে? আমার ডাক্তারখানার ত্রিসীমানায় আসতে দোব না। দু'দুজনকে শিখিয়েছিলুম হাতে ধরে—দুজনেই আমার ডিস্পেনসারী ফাঁক

ক'রে দিয়ে সরে পড়ল—শুনছি, সেই টাকা দিয়ে দেহাতে গিয়ে ডাক্তারখানা সাজিয়ে 'ডাগ্‌দার সাব' হয়ে বসেছে। ঝাঁ্যাটা মারো বাঙালীর মাথায়, অমন বেইমান আর নেই……এ কারবার করতে গেলে বুদ্ধু খোট্টাই ভাল।'

আর কথা বাড়ান নি ঠাকুর্দা। মোট-মোটারি নিয়ে—মোট আর কি, একটু বিছানা আর পাটনায় ওঁর আশ্রয়দাতা নিতাই বাবু একটা পুরোনো প্যাঁড়া দিয়েছিলেন, তাতেই কাপড় জামা—বাগচী সাহেবের বাড়ি এসে উঠেছিলেন।

রান্নার বিশেষ কিছু [illegible]তেন না ঠাকুর্দা। ভাতটাই নামাতে পারতেন শুধু। তবে তা[illegible]কোন অসুবিধা হয় নি। এঁদের পুরনো ঝি রামরতিয়া প্রথম থেকেই স্নেহের চোখে দেখেছিল ওঁকে—সে-ই পাকঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে নির্দেশ দিয়ে রান্না করিয়ে নিত। ভাত ডাল আর একটা তুটো ভাজা। নিরামিষ তরকারী ও-হেঁসেলে 'মছলি' কি 'শিকার' রান্না হওয়ার আগেই পাচক বা মহারাজ বলিরাম তৈরী ক'রে দিত গোপনে, তাই নতুন ঠাকুরের বলে চালানো হ'ত। রামরতিয়া স্পষ্টই বলত, 'আরে সিয়ারাম, সিয়ারাম! বাঙ্গালী মছ্‌লিখোর বাহ্‌মন আবার বাহ্‌মন নাকি!…আচার নেই, পূজাপাঠ করে না…………। বলিরামজীর হাতে খাবেন না—এর হাতে খাবেন। শির বিগড়ে না গেলে এমন বুদ্ধি হয়?'

বাগচীর যিনি শাশুড়ি—দীর্ঘ এবং বিরাট দেহ তাঁর, খুবই ফর্সা, এখনও মেমসাহেবের মতো গায়ের বর্ণ; এককালে হয়ত সুন্দরীই ছিলেন—মুখ চোখ দেখে তাই মনে হয়, এখন মোটা হয়ে গিয়ে সে রূপ নষ্ট হয়ে গেছে। এককালে নাকি খুবই কাজের লোক ছিলেন, রান্নাবান্নাও জানতেন খুব ভাল—'হরকিসিম্‌কে' মিঠাই বানাতে পারতেন,

সংসারের কোন কাজ অজানা ছিল না, করতেনও খুব। এই সংসারই ওঁর হাতে ছবির মতো ছিল। ইদানীং সব ছেড়ে দিয়েই আরও শরীরটা ভেঙ্গে গেল। বাতে ধরে গেছে, দিনরাত ঐ পাহাড়ের মতো পড়ে আছেন। জামাই ডাক্তার—তার ওষুধ খাবেন না, এখানের কে বৈদ্ আছে জড়িবুটি দেয়—তাই খাচ্ছেন। মালিশ করান না—দুর্গন্ধ বলে। বলেন, 'তাহলে আর কেউ আমার ত্রিসীমানায় আসবে না—আমি বেশ জানি।'

শাশুড়ি যেখানে জামাইয়ের বাড়ি অধিষ্ঠান হয়ে আছেন—সেখানে স্বভাবতঃই বৌয়ের কথা ওঠে।

বৌ—মানে ডাক্তারের স্ত্রী কৈ ?

বাড়িতে কেউই তো নেই বলতে গেলে অতবড় বাড়ি, থাকেন শুধু বাগচী সাহেব আর তাঁর শাশুড়ি—মালিক পক্ষের এই মোট দু'জন। এ ছাড়া চাকর, দু'জন ঝি, পাচক, মালী, সহিস-কোচোয়ান (নিজের টাঙ্গা আছে ডাক্তার সাহেবের) এবং এই নব নিযুক্ত ঠাকুর। এরাই বেশির ভাগ। প্রথম এখানে এসে চার-পাঁচ দিন নিজের কাজ বুঝে নিতেই বিব্রত ও ব্যস্ত ছিলেন ঠাকুর্দা। বিব্রত বোধ করার কথাও, একেবারেই অজানা কাজ। যা করতে যান সেটাই কঠিন মনে হয়। আনাড়ির ব্যাপার। ······সন্ধ্যের দিকে অবসর মিলত বটে, বিকেলের দিকটা পুরোই অবসর—কিন্তু তখন বাইরে বেরিয়ে পড়ার দিকেই মন পড়ে থাকত—নতুন শহরে এসেছেন, নবাবদের শহর, সুন্দরী শহর, সাহেবরা বলত 'সিটি বিউটিফুল'—শহর ঘুরে দেখতেই কেটে যেত অপরাহ্ণ আর সন্ধ্যা। পায়ে হেঁটে দেখা বলে সময়ও বেশী লাগত। ফিরে আসার পরও সেই নবদৃষ্ট দৃশ্য, সদ্যলব্ধ অভিজ্ঞতা নেশার মতো আচ্ছন্ন ক'রে রাখত মাথা আর মন—তখন তাই আর কিছু মনে আসত না।

পাঁচ সাত দিন কেটে যেতে—বৈসাদৃশ্যটা চোখে পড়ল। কৌতূহল

প্রবল হয়ে উঠল। জিজ্ঞাসা করলেন রামরতিয়াকে। রামরতিয়ার ভুরু একটু কুঁচকে উঠেছিল, তারপর কিন্তু প্রশান্ত মুখেই জবাব দিয়েছিল, 'দিদি ? দিদি মর গয়ী।'

কে জানে কেন, উত্তরটা ঠিক মনে ধরে নি ঠাকুর্দার। 'পেটের শত্তুর' কথাটা আড়াল থেকে মহিলার মুখে শুনেছেন বার-কতকই। চাপা গলায় আক্ষেপ করছেন তাও কানে গেছে, 'বাইরের শত্তুরকে পার আছে, ঝেড়ে ফেলা যায়—পেটের শত্তুর যে! যাকে বলে ওগরাবারও জো নেই, গেলবারও জো নেই—আমার হয়েছে তাই!'

ঠাকুর্দা একফাঁকে বলিরামকেও প্রশ্ন করেছেন। অতর্কিতে, একান্তে। ঠিক যে এত হিসাব ক'রে [illegible]ন তা নয়—এমনিই, হঠাৎ মনে হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গেই জিজ্ঞাসা করেছেন।

বলিরামও উত্তর দিয়েছে, 'দিদি ? দিদি মর গয়ী, আউর ক্যা ?'

বলেছে—কিন্তু কেমন এক ধরণের অর্থপূর্ণ চোখে চেয়ে হেসেছে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। এবার সন্দেহটা একটু বেশী রকমই হয়েছে। ঠাকুর্দা ঘুরতে ঘুরতে একসময় গিয়ে মালীকে জিজ্ঞাসা করেছেন—'আচ্ছা, মেমসাহেবকে দেখি না—তিনি কোথায় ?'

মালীও পুরনো লোক; সে দীর্ঘকাল সাহেবের কাছে আছে। সে ওর মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলেছে, 'কেন বলো তো ? সে খবরে তোমার কি দরকার ? আর দরকার পড়ে থাকে তো সাহেবকে জিজ্ঞাসা করো না।'

ঠাকুর্দা বলেছেন 'না, না, আমার কোন দরকার নেই। এমনিই, দেখি না, তাই। মানে মাজী রয়েছেন—মেমসাহেবের কী হ'ল—কথাটা মনে হয় তো—তাই।'

সহজ-স্বাভাবিক ভাবেই বলেন। মালীরও সন্দেহ কেটে যায়। তাছাড়া, এসব কথা তো ওরা বলতেই চায়, মনিব বাড়ির কেচ্ছা। মালী

গলা নামিয়ে বলে, 'মেমসাহেব বাইরে গেছেন। ···মানে এ শহরেই আছেন—আলাদা থাকেন, হুসেনগঞ্জে।'

ঠাকুর্দা আশ্চর্য হয়ে বলেন, 'তা মাজী তাহ'লে এখানে থাকেন কেন? ···মেয়ে জামাইয়ে বনে না বলে যদি মেয়ে আলাদা, সেখানে শাশুড়ি জামাইবাড়ি থাকেন—এ তো বড় তাজ্জব। তিনি তো মেয়ের কাছেই থাকলে পারেন।'

গলা আরও নামে মালীর, প্রায় চুপি চুপি বলে, 'মেয়ে জামাইয়ে বনে না কে বললে? ঝুট! বনে না মা আর মেয়েতে। মায়ের ওপর রাগ ক'রেই মেমসাহেব গেছে।'

আরও কিছু বলত হয়ত, বারান্দায় স্বয়ং সাহেবের পায়ের শব্দ পাওয়া যায়, ঠাকুর্দা কামিনীফুলের গাছের ফাঁকে অদৃশ্য হন।

ব্যাপারটা যে একটু ঘোরালো সে বিষয়ে ঠাকুর্দার আর কোন সন্দেহ রইল না। তাঁর কিছু না। তিনি একাজ করতে আসেনও নি—এই ভাত রাঁধার কাজ, এখানে বেশীদিন থাকবেনও না। ইতিমধ্যেই দু'একজনের মুখে শুনেছেন যে, কাশীতে বিস্তর বাঙালী—নিম্নমধ্যবিত্ত বেশির ভাগ—সামান্য দু'চার টাকা আয়ে সংসার চালায়, তাদেরই এই ধরনের ছেলে-পড়ানো লোক দরকার, যে দু'টাকা এক টাকায় বাংলা পড়াবে।

তাঁর মন সেই দিকেই ঝুঁকেছে। তীর্থবাসকে তীর্থবাস—জীবিকাকে জীবিকা। সেই ভাল, কাশীর তুল্য ধাম নেই, রামের তুল্য নাম নেই।··· সেজন্যে নয়, এমনিই একটা কৌতূহল হয় বৈকি!

'তক্কে তক্কে রইলুম, জানিস', ঠাকুর্দা বলেছিলেন, 'একদিন মওকা মিলেও গেল। রামরতিয়া প্রাণপণে বুড়ির সেবা করত, এটা ঠিক। সে শুনতে আসছে না তার ধম্ম শুনছে, গুয়ে-মুতে করা যাকে বলে, নিজের মেয়েও এত সেবা করে না। তার ওপর মাগীর ফাইফরমাশ অবিরাম।

কিছুই পছন্দ হ'ত না. ওর কথা শুনলে মনে হ'ত সবাই মিলে মাগীর ওপর খুব অন্যায় অবিচার সব করছে, অত্যেচার যাকে বলে। বিশেষ রামরতিয়া আর ডাক্তার সাহেব। ডাক্তার সাহেবের ওপর যে কি রাগ তা' তোকে কি বলব, পায় তো উকুনের মতো নখে টিপে মেরে ফেলে।

'একদিন এমনি মিথ্যে মিথ্যে ক'রে গাল পাড়ছে—রামরতিয়ার মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠেছে, দুপুরের দিক সেটা—আমি বললুম রামরতিয়াকে —"বুড়ি থাকে কেন এখানে পড়ে? জামাই যদি এত খারাপ, এখানে যদি সকলে মিলে এত খারাপ ব্যাভারই করে—বুড়ি মেয়ের কাছে চলে গেলেই তো পারে।"···

'রামরতিয়া এতদিনে ভুলে গেছে মেমসাহেবের কথা আমার কাছে কি বলেছিল, কিম্বা রাগের মাথায় আর অত রেখে-ঢেকে বলার কথা মনে পড়ে নি, সে বললে,—"হ্যাঁ, মেয়ের কাছে যাবে না আরও কিছু! অত কাণ্ড ক'রে মেয়েকে তাড়ালে কেন তবে? মেয়েকে তাড়িয়ে জামাইকে ষোল আনা ভোগ করবে বলেই তো আদাজল খেয়ে লাগল তার পেছনে, তার সাজানো ঘরকন্না ভোগ করতে দিলে না। ও কি মানুষ, ও ডাইনী। ···ঠিক হয়েছে, তেমনি সাজাও ভগবান দিয়েছেন—তার পর থেকেই দুনিয়ার যত বিমারী এসে ঘিরে ধরেছে, বাত, পেটের গোলমাল, বুকের গোলমাল—নেই কি? আর কতদিন বয়স ঢেকে ঢেকে খুকী সেজে বেড়াবে"?

'যা শোনবার—ওরই মধ্যে শুনে নিয়েছি। পুরোটা শুনি নি বটে—তা না হোক, ক্রেমে সবই বেরোবে। এমন সময় ঘাঁটাতে নেই আর। যা বলে ফেলেছে বেফাঁশ, রাগের ধমকেই—এরপর জোর করতে গেলেই সাবধান হয়ে যাবে। সেই দিনই রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর ছাদে পাশাপাশি শুয়ে বল্লিরামকে সটে-পটে চেপে ধরলুম—"কী ব্যাপার বলো তো বাবা বল্লিরামজী, তুমি তো সেদিন বললে দিদি বাবু মরে গেছে,

এই তো শুনছি এখন হুসেনগঞ্জে বাড়ি ভাড়া ক'রে আছে, সাহেবের সঙ্গে দেখাও হয় রোজ"।

'বলিরাম নিঃশব্দে হাসলে খানিকটা, তারপর বললে, "অমন ধাপ্পা দিয়ে আমার কাছ থেকে কথা আদায় করতে পারবে না বাংগালী বাবু, যা জিজ্ঞাসা করবে সিধাসিধা করো, আমিও সিধাসিধা জবাব দিচ্ছি। হুসেনগঞ্জে ছিল ঠিকই—এখন সুন্দরবাগে চলে গেছে, সেখানে কোঠী কিনেছে একটা। ......আর সাহেবের সঙ্গে দেখা হ'তেই পারে না—সে মুখ মেমসাহেব রাখে নি। গুস্‌সা ক'রেই গেছে এটা ঠিক, তবু খুবই খারাবী হয়ে গেছে কামটা। সাহেব কেন, কোন ভদ্দর আদমীর কাছেই মুখ দেখাবার আর পথ রাখে নি। ......তবু তো সাহেব ভাল। শুনেছি অনেক টাকা মেমসাহেবের নামে ব্যাঙ্কে জমা ক'রে দিয়েছে—যাতে নাকি তার খাওয়া-পরার কোন কষ্ট না হয়। সেও নিয়ে গিয়েছিল—জেবর, টাকা, কাপড়, বিস্তর জিনিস নিয়ে গেছে, নওলকিশোরকেও ছেড়েছে পাঁচ সাত দিনের মধ্যেই—টাকা খরচ হওয়ার কোন তরিকা নেই। তা ছাড়া ও যে কিছু হাতিয়ে নিয়ে সরে পড়বে এমন ছেলে নওলকিশোর নয়। খুব নেক্ ছোকরা ছিল নওলকিশোর, এদের পাল্লায় পড়ে তারই জিন্দিগী নষ্ট হয়ে গেল—নুক্‌সানটা উঠাল সে-ই। এ শহরে আর তাকে খেটে খেতে হচ্ছে না"।

'বুঝলুম তামুক তৈরী। টান দিলেই হয়, বুঝলি! আমিও মিষ্টি কথায় সব কিস্‌সা টেনে বার ক'রে নিলুম একটু একটু ক'রে। সবই খুলে বলল বলিরাম। তারও বোধহয় পেট ফুলছিল বলতে না পেরে।'

সে দীর্ঘ কাহিনী। ঠাকুর্দার জবানীতে বললে আরও দীর্ঘ হবে। তাই এখানে সংক্ষেপেই বলছি। ডাঃ বাগচী যখন কলকাতায় থেকে ডাক্তারি পড়তেন তখন তাঁর অবস্থা বিশেষ ভাল ছিল না। বাবা যজমানী ক'রে সংসার চালাতেন, তাতে তাঁর দুটি সংসার—দুটি সংসারই বিদ্যমান ছিল—মোট সতেরো আঠারটি ছেলেমেয়ে। হরিনাথ বাগচী ডাক্তার সাহেবের নাম—হরিনাথ খুব মেধাবী ছিলেন বলে ওঁর বাবারই এক যজমান বরাবর তাঁর পড়ার খরচ যুগিয়েছেন, মায় যখন এন্‌ট্রান্স পাস ক'রে ডাক্তারি পড়তে ঢুকলেন তখনও তিনিই খরচ-পত্র দিয়ে ভর্তি করিয়েছিলেন।

হাসিমুখেই টানছিলেন খরচা, শেষের দিকে ভদ্রলোক একটু 'কারে' পড়ে গেলেন। এক্সপোর্ট-ইম্‌পোর্টের ব্যবসা ছিল, তাতেই লাখখানেক টাকা লোকসান দিয়ে দেউলে খাতায় নাম লেখালেন। তবু হরিনাথকে পথে বসান নি একেবারে—তিনিই এই ওঁর বর্তমান শাশুড়িকে বলে-কয়ে সেখানে খাওয়া থাকার ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। মাইনেটা তিনিই দিতে থাকলেন অবশ্য। ইনি অর্থাৎ এখন যিনি সাহেবের শাশুড়ি, তরঙ্গিনী—অল্প বয়সে এই মেয়ে নিয়ে বিধবা হয়েছিলেন, ওঁদেরই আত্মীয়, ব্রাহ্মণ, পয়সা-কড়িও ছিল—কে দেখা-শুনো করে সেই হিসাবেই হরিনাথকে ওদের বাড়িতে রাখার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিলেন ওঁর প্রতিপালক সেই চক্রবর্তী মশাই। উভয় পক্ষেরই উপকার। চালাক চতুর চট্‌পটে ছেলে, লেখা পড়ায় ভাল—বিষয় সম্পত্তিও দেখা-শুনো করতে পারবে, অভিভাবকের মতো থাকবে, অবসর-সময়ে মেয়ে তড়িতকে একটু লেখা-পড়াও শেখাতে পারবে—তাতে ওঁদেরই বেশী উপকার—তরঙ্গিনীকে সেই কথা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন চক্রবর্তী।

তখন হরিনাথের বয়স তেইশ চব্বিশ হবে—তখনকার দিনে বেশী বয়সেই লেখাপড়া শিখত—তড়িতের দশ-বারো, আর তরঙ্গিনীর সাতাশ-আটাশ। এখনকার নিয়ম অনুসারে তড়িতের সঙ্গেই হরিনাথের প্রেমে পড়া উচিত ছিল, কিন্তু হরিনাথ এক পুরুষ পেছিয়ে গেলেন! অবশ্য হরিনাথের কতটা দোষ ছিল এ ব্যাপারে তা বলা শক্ত। তরঙ্গিনীই এই সুপুরুষ বুদ্ধিমান মেধাবী ছেলেটির প্রেমে পড়ে তার মাথাটি খেলেন।

এইভাবেই চলছিল। সমাজে যথেষ্ট ঘোঁট হ'লেও যেহেতু তরঙ্গিনীর হাতে টাকা ছিল—বিশেষ কেউ কিছু করতে পারে নি। হরিনাথও ভালভাবে পাস ক'রে বেরিয়ে কলকাতাতেই ডাক্তারখানা খুলে বসে বেশ পসার জমিয়ে নিলেন—তাঁরই বা কে কি করবে?

করতে যেটা পারে—সেইটেই করল আত্মীয়রা, তড়িতের বিয়েতে বাগড়া পড়তে লাগল। কিছুতেই কোথাও বিয়ে হয় না—প্রচুর টাকা খরচ করার প্রলোভন দেখিয়েও না। দূর-দূরান্তে ঘটক পাঠিয়ে বিদেশে কোন সম্বন্ধ হয়ত ঠিক করেন তরঙ্গিনী—যথা সময়ে তারা খবরটি পৌছে দিয়ে আছে। ফলে পাত্রপক্ষ বিয়ে ভেঙ্গে দেয়—সেই সঙ্গে দেয় কিছু গালাগালি।

এইভাবে বছরের পর বছর কেটে যায়—এধারে মেয়ে ষোল থেকে সতেরোয়, সতেরো থেকে আঠারোয় পৌছয়—বিয়ের কোন ব্যবস্থাই করা যায় না। তখনকার দিনে তেরো পেরোলেই জাতে ঠেলত। নেহাৎ এদের এখন এমনিতেই জাত বলতে কিছু নেই—একঘরে হয়েই আছে বহুকাল—এদের আর কি করবে?

তবু ব্যস্ত হয়েই উঠলেন তরঙ্গিনী। শেষ পর্যন্ত যেটা শোভন এবং সঙ্গত, যা বহু আগেই করা উচিত ছিল—তাই করলেন, হরিনাথের সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে দিলেন। শুধু তাই নয়, পূর্বের ইতিহাসে যবনিকা টানতে—কলকাতার পাট একেবারে তুলে দিয়ে বহুদূরে এই লক্ষ্ণৌতে চলে

এলেন, যেখানে পরিচিত কেউ নেই। এ বাড়িও তরঙ্গিনীর টাকাতেই কেনা, যদিও বুদ্ধি ক'রে ডাক্তার সাহেব নিজের নামে করিয়ে নিয়েছিলেন দলিল তৈরীর বেলা।

বাড়ি কিনে, ডাক্তারখানা সাজিয়ে দিয়ে জামাইকে—যাকে বলে থিতু ক'রে দেওয়া—তাই করলেন। হরিনাথ ডাক্তারী বিদ্যেটা সত্যিই শিখেছিলেন, তাই এখানেও দেখতে দেখতে পসার জমে গেল, রাশি রাশি টাকা রোজগার করতে লাগলেন; গাড়ি-ঘোড়া, চাকর-দারোয়ান রেখে 'রইস আদমী'র চালেই সুপ্রতিষ্ঠিত হলেন।

এরপর সম্ভবত একটু নিশ্চিন্ত শান্তি আশা করেছিলেন তরঙ্গিনী, তা পেলেন না।

নিজের মেয়েই বাদ সাধল।

অথবা, মেয়ে বলাও ভুল—প্রকৃতিই তার নিয়ম পালন করল, যা হওয়া উচিত তাই হ'ল।

তড়িতও সুন্দরী, মায়ের থেকেও বেশী। অল্প বয়স তার, হরিনাথ পরিণত-যৌবন, সুপুরুষ। তরঙ্গিনী ততদিনে বাঙ্গালীর হিসেবে প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে গেছেন। হরিনাথ আর তড়িৎ পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট হয়ে আসক্তি বোধ করবে এটাই স্বাভাবিক। বিশেষ তড়িতের এটা হক্কের পাওনা, সে ছাড়বে কেন? তরঙ্গিনীরই অবস্থা বুঝে মানে মানে সে অধিকার ছেড়ে দেওয়া উচিত ছিল, উচিত ছিল পিছিয়ে এসে নিজের পরকালের চিন্তা করা—তা তিনি পারলেন না। বরং যেন ক্ষেপে উঠলেন একেবারে। বলিরামের ভাষায়—'আপনা বিটি শৌহর হয়ে উঠল।'

তবু বহুদিন পর্যন্ত হরিনাথ দুদিক সামলে চলেছিলেন। বোধ করি দুজনকেই বোঝাতেন যে তার প্রতি আসক্তিটাই সত্য—অপরেরটা লোক-দেখানো, স্তোক। সে কথার কিছু ষোল আনা মিথ্যেও নয়। হয়তো

তড়িতের প্রতি নবোদ্ভূত কামনাও যেমন সত্য—তেমনি সত্য পুরাতন অভ্যাসটাও। হয়তো তরঙ্গিনীর মোহ তখনও সম্পূর্ণ কাটে নি। হয়তো বা কৃতজ্ঞতার প্রশ্নও ছিল, কিম্বা অশান্তির ভয়।

তরঙ্গিনীর জন্যেই ডাক্তার বার বার তড়িতের সন্তান-সম্ভাবনা নষ্ট করছিলেন। সন্তান হওয়ার পর এই দ্বি-সত্তা বজায় রাখা সম্ভব হবে না। কিন্তু ক্রমশঃ তড়িৎ বিদ্রোহ করল, ছেলে আর নষ্ট হ'তে দেবে না সে। কিছুতেই না। কোন কথাই আর শুনতে প্রস্তুত নয়। আর শুনবেই বা কেন, সে কি বিধবা ?—যে ছেলে হ'লে লজ্জায় মুখ দেখাতে পারবে না—সেজন্যে গোপনে সন্তান নষ্ট ক'রে ফেলতে হবে ?

তড়িৎ এটা বুঝেছিল যে এর প্রতিকার করা হরিনাথের দ্বারা সম্ভব হবে না, দীর্ঘকাল তরঙ্গিনীকে সমীহ করা, ভয় করা তার স্বভাবে পরিণত হয়েছে। সুতরাং যা করতে হবে—এস্‌পার-ওস্‌পার—তাকেই করতে হবে। স্বামী-স্ত্রীর বৈধ সম্পর্কটা লজ্জার কারণ বলে গণ্য হবে, সেটা গোপনে সারতে হবে অবৈধ প্রেমের মতো—আর যেটা অত্যন্ত ঘৃণ্য ও অবৈধ সেটা প্রকাশ্যে চলবে, এ অবিচার ও অস্বাভাবিক অবস্থা সে সহ্য করবে না কিছুতেই।

এই মতলবেই একদিন, ইচ্ছে ক'রে—যাকে বলে গায়ে-গাছ-কেটে ঝগড়া বাধিয়ে—আসল কথাটা শুনিয়ে দিল মাকে ! হরিনাথ তরঙ্গিনীকে ঘৃণা করেন, শুধু অশান্তির ভয়েই মিথ্যা কথায় ভুলিয়ে রাখতে বাধ্য হন; সত্যিকার ভালবাসা তাঁর বিয়ে-করা বৌয়ের সঙ্গেই ; আর তাই তো স্বাভাবিক, উচিত। তরঙ্গিনীর তিনকাল গিয়ে এককাল ঠেকেছে, গঙ্গা-পানে পা হয়েছে—এখনও এ অস্বাভাবিক প্রবৃত্তি সামলাতে পারে না ? এবার তো বোঝা উচিত। এখনও এই চালাতে চায় সে ? ঘেন্না-পিত্তি বলে কি কিছু ভগবান দেন নি ওকে ? ইত্যাদি—

কথাগুলো বেশ প্রকাশ্যভাবেই বলেছিল তড়িৎলতা। গোপন ক'রে

গলা নামিয়ে বলার প্রয়োজন বোঝে নি, ঝি-চাকরদের শুনতে কোন বাধা ছিল না। প্রয়োজন বোঝে নি এইজন্যে যে সাহেব ও তাঁর 'শাস'-এর সম্পর্কটা ওদের কারুরই জানতে বাকী ছিল না। ডাক্তার যে প্রতিদিন মধ্যরাত্রে তরঙ্গিনীর ঘরে যান ও শেষরাত্রে নিজের বা তড়িতের ঘরে চলে আসেন—সেটা একদিন না একদিন সকলেরই চোখে পড়বে বৈকি!

কিন্তু এই যে সামান্য অন্তরালটুকু ছিল, লজ্জার এই পত্রাবরণটুকু—সেটা ঘুচিয়ে দিয়ে প্রচণ্ড একটা ভুলই ক'রে বসল তড়িৎ। তরঙ্গিনীও মুখোশ খুলে দিয়ে পিশাচীর মূর্তি ধারণ করলেন একেবারে। এমন কাণ্ড বাধিয়ে তুললেন যে, তারপর আর—মা ও মেয়ে—দুজনের একত্রে থাকা সম্ভব নয়।

হরিনাথ না পারলেন মেয়েকে বাধা দিতে, না পারলেন মেয়ের মাকে। তাতেও অত ক্ষতি হ'ত না—যদি না এটা স্পষ্ট হয়ে উঠত যে হরিনাথ মেয়ের থেকে মাকেই বেশী সমীহ করেন, বা তার মন-যোগানোর চেষ্টাতেই, তাকে শান্ত করতেই বেশী ব্যস্ত। পুরুষ মানুষ অশান্তিকে যত ভয় করে এমন আর কিছুকে নয়। আর মেয়েদের কাছে ওটা তত প্রিয়। মধ্যে মধ্যে ঘোরতর রকমের একটা অশান্তি না বাধালে তাদের কাছে জীবনটা বড় বৈচিত্র্যহীন বিস্বাদ লাগে। আর সেই কারণেই পুরুষের মনোভাব তাদের কাছে দুর্জ্ঞেয় মনে হয়। ক্লেদ অশান্তির ভয়ে মানুষ আর সব বিবেচনাকে তুচ্ছ করতে পারে, এটা মেয়েদের মাথায় একেবারেই ঢোকে না।

হরিনাথ যে তড়িতের স্বাভাবিক প্রেমের ওপর ভরসা ক'রে—তাকে নিজের দলের লোক, তার উপর জোর বেশী ভেবে—তার মাকে মিথ্যা আশ্বাসে ভোলাতে চাইছেন—কেবলমাত্র নিছক অশান্তির ভয়ে—এটা তড়িতের মাথাতে কিছুতেই গেল না, এ তার বুদ্ধির অগম্য, অবিশ্বাস্য তার কাছে। সে এই আশঙ্কাকে সত্যিকার ভালবাসা ভাবল। মনে করল

তার প্রতি আচরণটাই আসলে স্তোক, হরিনাথের কাছে সে শুধু সাময়িক সম্ভোগের বস্তু, তাই তাকে মিথ্যা-মধুর কথায় ভুলিয়ে কাজ আদায় করতে চেয়েছে এতদিন। তাই যখন দুজনের একজনকে বেছে নেবার প্রশ্ন উঠেছে, তখন আসল যে প্রেমাস্পদ তাকেই বেছে নিয়েছে।

সেও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল একেবারে। তখন তার সবচেয়ে বড় চিন্তা হ'ল কি করলে স্বামীকে সবচেয়ে বড় আঘাত দেওয়া যায়। পুরুষ, বিশেষত প্রতিষ্ঠিত কোন পুরুষ মানুষকে অপদস্থ, হাস্যাস্পদ ক'রে তোলার থেকে মর্মান্তিক আঘাত আর কিছু দেওয়া যেতে পারে না—এ সহজ জ্ঞানটুকু তার ছিল। সেই পথই সে ধরল। কিন্তু তাতে যে নিজেরও ইহকাল পরকাল, একূল-ওকূল নষ্ট হয়ে গেল, এ ভুল যে সংশোধনের পথ রইল না— তা একবারও ভেবে দেখল না।

নওলকিশোর ছিল হরিনাথের দারোয়ান, সুশ্রী, বিনত, ভদ্র চরিত্রের লোক—লোক কেন ছোকরা বলাই উচিত, বয়স তার তখনও ত্রিশের উপরে নয়, বরং বোধহয় অনেকটা নিচেই—বিজনোর জেলায় বাড়ি, মা-ভাই-স্ত্রী সব আছে—বোধহয় একটা বাচ্চাও হয়ে গেছে, সেকথা লজ্জাতে কাউকে বলে নি। ভদ্র শান্ত স্বভাবের জন্যে বছর তিনেকের মধ্যেই সাহেবের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিল, দারোয়ান থেকে প্রকৃত পক্ষে সেক্রেটারী হয়ে উঠেছিল। ইদানিং 'কলে' যাবার সময়ও সঙ্গে নিয়ে যেতেন। ডাক্তারখানাতেও যেতে শুরু করেছিল সে।

এই নওলকিশোরকেই বেছে নিল তড়িৎ।

ওর মতো সুন্দরী তরুণী মেয়ে পিছনে লাগলে বিশ্বামিত্র দুর্বাসারও মন টলে—নওলকিশোর তো কোন ছার। একদা প্রায় প্রকাশ্যেই হুসেনগঞ্জে একটা বাড়ি ভাড়া ক'রে নওলকিশোরকে নিয়ে সেখানে গিয়ে উঠল। টাকাকড়ি গয়নাপত্র নিয়ে, একরকম মাকে বলে-কয়েই চলে গেল।

অর্থাৎ নিজের সর্বনাশ ভাল ক'রেই করল নিজে।

আসলে তড়িৎ এতদিনে স্বামীকে সত্যি-সত্যিই ভালবেসে ফেলেছিল, বরং বলা উচিত বহুদিন থেকেই বেসেছে। সেই দশ-এগারো বছর বয়সের সময়—যখন এই সুদর্শন তরুণ যুবকটি প্রথম ওদের বাড়িতে আসে—তখন থেকেই। একান্তমনে কামনা করেছে ওকে, মনের সবটুকু আবেগ ঢেলে দিয়ে। মার বিসদৃশ আচরণে অস্বাভাবিক আসক্তিতেই সে মনোভাব প্রকাশ করতে পারে নি—মার প্রতি ঘৃণায়, কিছুটা ভয়েও বটে। আর তখন থেকেই তাই লক্ষ্য ছিল, অন্য কোন পুরুষ নয়—এই মানুষটিকেই সে জয় ক'রে নেবে একদিন মার কাছ থেকে।

বহুদিনের এই ইচ্ছার আপাত-ব্যর্থতাতেই পাগল হয়ে গিয়েছিল তড়িৎ—তাই হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে প্রত্যাবর্তনের, ভ্রম সংশোধনের সমস্ত পথ ঘুচিয়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল। কিন্তু বেরনোর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সে ভুল ভেঙ্গেছে, নিজের মনের চেহারাটা স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে। নওল-কিশোরের প্রতি কোন দিনই কোন আসক্তি বোধ করে নি—এখন তো তার সঙ্গ অরুচিকর হয়ে উঠল রীতিমতো। তাকে সব বুঝিয়ে বলে শ'পাঁচেক টাকা দিয়ে দেশে পাঠিয়ে দিল, সেখানে গিয়ে কিছু জমি নিয়ে ক্ষেতীউতি করতে—মোরাদাবাদ কি বেরিলি কোথাও গিয়ে নতুন নৌকরি খুঁজতে। মোট বোধহয় আট দিনের বেশী একত্র থাকে নি ওরা—নতুন বাসায় গিয়ে।

ঠিক—এই সময়টাতেই, তড়িতের গৃহত্যাগের মাস তিন চার পরেই ঠাকুর্দার প্রবেশ ঐ রঙ্গমঞ্চে, এর পরের ঘটনা তাঁর জবানীতে শোনাই ভাল।

'কী বলব তোকে নাতি, এই কেলেঙ্কারের কথা শুনে গা ঘিন-ঘিন করতে লাগল। কেচ্ছা কেলেঙ্কার চার যুগ আছে, কোন দিনই কেউ

একেবারে সাচ্চামোতি ছিল না, পুরাণ তো পড়েছিস, পরাশর বিশ্বামিত্রর মতো তাবড় তাবড় ঋষিরাই কত কি ক'রে গেলেন—তা আমরা তো কোন ছার। তা বলছি না, তবু এই মা আর মেয়েতে ঐ একটা পুরুষকে নিয়ে এই বিচ্ছিরি টানাটানি, প্রকাশ্যে লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে চাকর-বাকরদের সামনে এই খেয়োখেয়ি—নোংরামি, এ যেন সহ্য হ'ল না। এখন হ'লে হ'ত—তখন দিনকাল ছিল অন্য, আমারও বয়স কাঁচা, ঠাকুরের নামে জুচ্চুরি করতে হবে বলে যজমানি করলুম না—পৈতৃক পেশা ছেড়ে পথে নামলুম—এখানে এই আবহাওয়াতে ভাত রাঁধার চাকরি করা আমার পোষাবে না, বেশ বুঝলুম। যদি উঞ্ছবৃত্তি করতেই হয়—বামুনের ছেলে হাতে পৈতে জড়িয়ে ভিক্ষেই করব, সে ঢের শান্তি, এ পাপের ভাত খাব কেন ?

'যাব এটা তো ঠিক —কিন্তু মনে হ'ল যাওয়ার আগে এর একটা বিহিত ক'রে যাব না ? মনে মনে একটা মতলব আঁটলুম। শাস্ত্রে পাঁচ রকম মিথ্যের কথা বলা আছে, বিশেষ অবস্থায় বা বিশেষ লোকের কাছে মিথ্যে বললে পাপ নেই—এ সবাই বলে গেছেন। প্রাণ রক্ষার্থে মান রক্ষার্থে, সর্বনাশের সামনে দাঁড়িয়ে—আর যে কোন অবস্থাতেই মেয়েদের কাছে মিথ্যে কথা বললে দোষ হয় না।·········আর তা'ছাড়া জীবনে একেবারে যে মিথ্যে বলি নি তা তো নয়—একটা ভাল কাজে না হয় বললুমই।

'মনে মনে মতলব ফেঁদে বেরিয়েছি, সামনেই এক ভণ্ড সন্ন্যিসীর সঙ্গে দেখা, ঐ যে যারা মিষ্টি মিষ্টি ক'রে পাঁচটা কথা বলে, হাত দেখার ভান ক'রে মেয়ে ঠকিয়ে খায়, দেখিস নি ? কাশীতে তো দেদার, কলকাতাতেও পথে পথে ঘোরে শুনেছি, চিরদিনই আছে ওরা, ও একটা পেশা, যাই-হোক—পেলুম তো বেটাকে, আড়ালে নিয়ে গিয়ে বললুম, "ওসব অং বং ছাড়ো বাবা, আমিও এই লাইনের লোক, আমাকে চাল দিতে এসো না, ওসব ভিরকুটি আমি বেশ জানি। যা বলছি মন দিয়ে

শোন, লাগসই কতকগুলো মিথ্যে বলতে পারবে? যদি পারো তো গোটা একটা টাকা দোব বকশিশ”!

‘একটা টাকা তখনকার দিনে কুবেরের ঐশ্বর্য। লক্ষ্ণৌতে কুড়ি সের গম পাওয়া যেত এক টাকায়, পনেরো ছটাক ঘি, এক পয়সা সের তোফা পাহাড়ে নৈনীতাল আলু—······সে বেটা তো ধিনিক্ ধিনিক্ নাচতে শুরু করেছে একেবারে, বলে, যা বলবে তাই করব। আমিও ভেবে দেখলুম আমার তো অন্ধ জাগো না কিবা রাত্র কিবা দিন। পথের লোক পথেই নামব—এর পাপের পয়সা যা পেয়েছি তা থেকে একটা টাকা খরচা ক’রে যদি একটু প্রাচিত্তির ক’রে যেতে পারি—মন্দ কি?’

সন্নিসীটাকে শিখিয়ে পড়িয়ে রেখে, বেলা তিনটের সময় রাস্তার মোড়ে এসে দাঁড়াতে বলে বাড়িতে এলেন রমেশ ঠাকুর্দা। গিন্নীমাকে গিয়ে বল্লেন, ‘মা, একটা কথা বলছি, মনে কিছু করবেন না, আপনার এই বাতের ব্যামোটা সেরে গেলেই, সহজ মানুষ, উঠে-হেঁটে বেড়াতে পারেন—তা এসব ব্যামোতে তো শুনেছি দৈবই ভালো। শুনে এলুম গোমতীর ধারে কে এক সন্ন্যাসী এসেছেন—যাকে যা বলে ফুল দেন, মাদুলি ক’রে পরলে ব্যামো ভাল হয়ে যায়—তিনদিনে। দেখবেন একবার চেষ্টা ক’রে?’

বুড়ি তো সোজা হয়ে বসেছে একেবারে, ‘কোথায় বাবা, কোথায়? ···কিন্তু আমি তো উঠে যেতে পারব না—তিনি কি আসবেন? কী হবে বাবা, তাঁকে আনবার?’

‘মহা বদ মাগী, খিঁচিয়ে ছাড়া কথা বলত না—এখন নিজের স্বার্থে হা-বাবা যো-বাবা।···যাক গে মরুক গে, “দেখি” এই বলে বেরিয়ে ঘুরে ফিরে এসে—মাগীর কাছ থেকে টাঙ্গাভাড়া বলে দুটো টাকা আদায় ক’রে তিনটের সময় তো আমার সন্নিসী ঠাকুরকে নিয়ে এলুম।··· এই জটা, ছাইমাখা। আবার এধারে গেরুয়া রঙের আলখাল্লা, ছেন্দা না

হয়ে যায় কোথা ? ···ভাল বাঘছাল ছিল বাড়িতে, রামরতিয়া পায়ের ধুলো নিয়ে জিভে ঠেকিয়ে ভাল ক'রে বসতে দিল, সামনে কোশাকুশি, জল, ফুল সব গুছিয়ে দিল।

'কিন্তু সন্ন্যিসী ঠাকুর দু'মিনিট চোখ বুজে বসে থেকেই তিড়িং ক'রে লাফিয়ে উঠল যেন। ···আমিই শিখিয়েছি কিন্তু সত্যি কথা বলছি নাতি, সে য়্যাক্‌টো দেখে আমিই চমকে গেছি একেবারে! গুরুমারা বিদ্যে যাকে বলে। চোখে কি আগুন, ধ্বক্-ধ্বক্ ক'রে জ্বলছে যেন— বলে, "পাপ, পাপ! এই বেটা, আমাকে কোথায় এনেছিস ? ভরষ্ট্ হ্যায় ইয়ে আওরৎ, বহুৎ পাপ!···আমার দেহ জ্বলছে এর গায়ের হাওয়া লেগে। আমি এর কিচ্ছু করতে পারব না, যমদূত এসে শিয়রে দাঁড়িয়েছে —দেখতে পাচ্ছিস না ? একটু একটু ক'রে পুড়িয়ে পুড়িয়ে মারবে এরা, ঐ যে খল্‌খল্ ক'রে হাসছে। ···না, না, আমি আর এ বাড়িতে থাকব না, এক মিনিট নয়—"

'বলতে বলতেই তরতর ক'রে নিচে নেমে এসেছে সন্ন্যিসী, তার তখনকার মুখ-চোখের চেহারা দেখে কে বলবে যে আমার শিখ্‌নেতেই এত কথা বলছে! রোখ্ কি! বুড়ি টাকা পয়সার কথা বলতে এসেছিল, রামরতিয়াকে পাঠিয়েছিল পিছু পিছু—তাকে তেড়ে মারতে উঠল একেবারে, "তোদের বাড়ির পয়সা নোব আমি? কি পেয়েছিস আমাকে ?—এর সবেতে পাপ—ঐ মেয়েছেলেটা সাক্‌সাৎ পাপ—এ বাড়ির প্রতি ইঁটে পাপ, আমার শরীর জ্বলে গেল" !

'হবি তো হ—ঠিক-সেই সময়ই দুপুরের 'কল' সেরে ফিরছে ডাক্তার, অমনি দেরিই হ'ত, তিনটে-চারটে, সেই আন্দাজেই ঐ সময়টা ঠিক করেছিলুম। ডাক্তার তো বাড়ির মধ্যে সন্নিসী দেখে অবাক। একটু বিরক্তও হ'ল। এসব তখনকার দিনের 'সায়েব'রা পছন্দ করত না।

'তবে যেমন বুনো ওল, তেমনি বাঘা তেঁতুলেরও ব্যবস্থা ছিল বৈকি!···

একবার ওর দিকে তাকিয়েই সন্ন্যিসী ঠাকুর যেন আবার তিড়িং বিড়িং ক'রে লাফিয়ে উঠল। বলে, "পাপ! পাপ! পাপে জ্বলে গেল আমার শরীর। ······তোর সর্বনাশ হবে, ঐ সাক্ষাৎ পাপের সঙ্গে আছিস। সতী-লক্ষ্মীর চোখের জল পড়ছে—এক এক ফোঁটা চোখের জলের আগুন নেভাতে এক এক বালতি দেহের লোহু ঢালতে হবে"।

'বলতে বলতেই ছুটে বেরিয়ে গেল সে। ডাক্তারের মুখের যা অবস্থা তখন—কী বলব তোকে, অত বুদ্ধিমান লোক তো—লেখা-পড়া জানা—কিন্তু দৈবকে এমনই ভয় আমাদের—মুখ শুকিয়ে এতটুকুন্ হয়ে গেল। লোকটা ভণ্ড কি খাঁটি সাধু—তা একবার ভাববার চেষ্টাই করল না। যাকে বলে বসে পড়ল একেবারে।

'তাই কি ছাই—ব্যাপারটা তারিয়ে তারিয়ে দেখব সে জো আছে, রামরতিয়া সাধুকে না পেয়ে আমারই পায়ে পড়ে—"যাও মহারাজজী, মহাৎমাকে শুধিয়ে এস কি করলে এ বিমারীর আসান হবে মাজী'র। পাপ কি ক'রে কাটবে"।

'অগত্যা আমাকে ছুটে বেরোতে হ'ল। সাধু তো গ্যাঁট হয়ে মোড়ের বড় বাড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে বকশিশের লোভে। তা দিলুম, আমি খুশী হয়েই দিলুম ব্যাটাকে—বুড়ি যে গাড়ি ভাড়া বলে দু'টাকা দিয়েছিল সে দু'টাকা, আমার নিজের তবিল থেকে যে টাকাটা দেবার কথা ছিল সেটাও—মোট তিনটে টাকাই দিয়ে দিলুম। সাধু তো মহা খুশী, আমার মতো পুণ্যাৎমা সত্যবাদী লোক সে আর নাকি দেখে নি—খুব আশীর্বাদ করতে করতে চলে গেল।

'আমি ফিরে এসে রামরতিয়াকে বেশ চিন্তিত মুখেই বল্লুম, "যা বলেছে মহাৎমাজী তা কি তোমার মাজী পারবে? বলেছে যদি বাঁচতে চাও কোন তীর্থে গিয়ে বাস করতে—আর হাজার বার রামনাম জপ করতে, তীর্থে গেলে যমদূতরা ছেড়ে দেবে, রামনামে পাতক কাটবে"।

'আমি ফিরেছি শুনে ডাক্তারবাবুও ডেকে পাঠালেন—"কী ব্যাপার এসব রমেশ ?" খুব ভারী আওয়াজ, কিন্তু মুখ দেখলুম তখনও সাদা, কপালে ঘাম। বললুম, নির্ভয়েই বললুম—আমি তো জানি আজই চাকরি ছেড়ে দেব, আমার আর ভয়টা কী ?—"মায়ের অসুখ, উনি বলেছিলেন —তাই ঐ সাধুকে ধরে এনেছিলুম, খুব ভারী সাধু—যাকে যা বলেন তাই হয়, বহুলোকের রোগ সারিয়ে দিয়েছেন—তাই মা গাড়ি-ভাড়া দিলেন— আসতে কি চায়—অনেক কাকুতি মিনতি ক'রে ধরে এনেছিলুম। তা— ঐ তো শুনলেন, উনি তো রেগে আগুন হয়ে চলে গেলেন, গাড়ি-ভাড়া অব্দি নিতে চান না"।…

'এই বলে—সাধু যা বলে গেছে সব খুলে বল্লুম। মায় শেষ প্রেসক্রিপশ্যানটা সুদ্ধ। সাহেবের তখন ঘাড় গলা দিয়ে সেই ঠাণ্ডার দিনেও দর দর ক'রে ঘাম গড়াচ্ছে। বেচারীর অবস্থা দেখে মায়া হ'ল। বল্লুম, "একটা কথা বলব ডাক্তার সাহেব ? যদি অপরাধ না নেন তো বলি—যা হয়ে গেছে তা হয়েছে—আজই দিদির কাছে চলে যান, সেখানে গিয়ে ক'দিন থাকুন"।

'ভেবেছিলুম—এই রকম আস্পদ্দার জন্যে কড়া ধমক খাব একটা, কিন্তু তখন অতবড় ডাক্তারটা ছেলেমানুষ হয়ে গেছে একেবারে, সে দিক দিয়েই গেল না, শুধু বল্লে, "তুমি কি বলছ রমেশ, তুমি জান না সে কি ক'রে গেছে। এরপর তাকে ঘরে আনলে, কি সেখানে গিয়ে থাকলে লোকে কি বলবে" ?

'আমি আর থাকতে পারলুম না—বুঝলি, বলে ফেললুম, "বাবু, আমি সব জানি, চাকরবাকরদের কি আর কোন কথা জানতে বাকী থাকে ? না কি এই শহরেরই কোন বাঙ্গালীর জানতে বাকী আছে মনে করেন। এখন যা বলে তখন তার চেয়ে আর বেশী কি বলবে ?……আপনি বড় ডাক্তার—মুখ বুজে সব সহ্য ক'রে বাড়িতে ডাকবে। বরং ভুলটা শুধ্রে

নিলে—দিনকতক পরে ভুলেই যাবে ব্যাপারটা।…তখন বরং বুক ফুলিয়ে চলতে পারবেন এই শহরে”।

‘ভেবেছিলুম নিদেন এবার একটা ধমক খাব—কিন্তু দেখলুম—যে ধমক দিতে পারত সে আর নেই। এতটুকু হয়ে গেছে মানুষটা—। চুপ ক’রে মাথা হেঁট ক’রে বসে রইল চেয়ারের ওপর কাঠ হয়ে। মনে হ’ল যেন কেমন চুপ্‌সে গেছে ফুটো বেলুনের মতো।

‘আমি সেইদিনই ডাঁট দেখিয়ে কাজ ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। সবাই খুব ধর-পাকড় করলে—বুড়ি, রামরতিয়া, বলিরাম, মায় খোদ ডাক্তার সায়েব পজ্জন্ত।…আমি বল্লুম, “না, এত অনাচারের বাড়িতে আমি আর থাকব না, বামুনের ছেলে না জেনে যা করেছি, করেছি—আর নয়।” বলিরামকে বল্লুম, “ভাই, তুমি বলেছিলে—কিন্তু আমি অতটা বিশ্বাস করি নি—এখন মহাৎমার কাছে শুনে বিশ্বাস হ’ল। মাপ করো—আমি মছলীখোর বাহ্‌মন ঠিকই—তবু এ পাপের ভাত আর না”।

‘তারপরও ক’দিন লক্ষ্ণৌ ছিলুম, চার-পাঁচদিন, শুনেছি, সাহেব সেই দিনই সুন্দরবাগে বৌয়ের বাড়ি গিয়ে উঠেছিলেন—আর এ বাড়ি আসেন নি। তারপরও খবর পেয়েছি—মাগী অনেক কান্নাকাটি ক’রেও জামাইয়ের মন গলাতে পারে নি আর। তখন রামরতিয়াকে নিয়ে পৈরাগে চলে এসেছে। কাশীতে আসতে সাহস করে নি, বেস্তর চেনা লোক, আপ্ত-কুটুম।……ওর হাতেও ঢের টাকা ছিল, জামাইও শুনেছি মাসোহারা দিত। তবে বেশীদিন নাকি বাঁচেও নি—ওদের অব্যাহতি দিয়ে গেছে তাড়াতাড়ি।’

এই বলে দীর্ঘ কাহিনী শেষ ক’রে, নিঃশব্দে খুব খানিকটা হেসে নিয়েছিলেন ঠাকুর্দা। কৃতিত্ব ও কৌতুকের হাসি।

॥ ৯ ॥

উনিশশো বাইশ সালে আমরা কাশী থেকে কলকাতায় চলে এলুম—বলতে গেলে চাটিবাটি তুলে। রমেশ ঠাকুর্দার সঙ্গেও সেই ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। প্রথম প্রথম দু-একখানা চিঠি আসা-যাওয়া করেছে—তার পর উভয়পক্ষেই উৎসাহ গেছে কমে। রমেশ ঠাকুর্দার যা অবস্থা, এক পয়সার পোস্টকার্ড দেওয়াও তাঁর পক্ষে কষ্টকর। চিঠি লেখার তেমন অভ্যাসও ছিল না তাঁর—তাই আমরা চিঠি দিলেও তার জবাব যেতে তিনমাস লাগত। ফলে আমাদের চিঠি দেওয়াও কমে গেল। অন্য দু-চারজন পরিচিত লোকদের চিঠিতে যা জানা যেত ওঁদের খবর। কিন্তু সে চিঠিও কমে এল ক্রমে। প্রথম প্রথম যে বিচ্ছেদ অসহ বলে মনে হয়—কিছুদিন পরে আর তার কথা মনেও থাকে না।

ঠাকুর্দার সঙ্গে আবার দেখা হল একেবারে উনিশশো বত্রিশ সালে। তখন আমি অকালে কলেজ ছেড়ে কিছু কিছু রোজগারের চেষ্টায় জীবনের ঘাটে ঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছি। চেষ্টা করছি তার কোন একটা নিরাপদ কূলে চিরদিনের মতো ভাগ্যের নৌকোটা ভেড়ানো যায় কিনা।

সত্যিই অনেক ঘাটের জল খেয়েছি সেই বয়সেই। অর্থাৎ অনেক কিছুই করেছি—সামান্য দুটো চারটে টাকার জন্যে। সেই রকমই একটা ঠিকে কাজে কাশী গিছলুম সেবার। শুধু কাশী কেন—সারা উত্তর প্রদেশই ঘোরার কাজ—তখন অবশ্য সংযুক্ত প্রদেশ বলত, ইংরেজীতে ইউ. পি. (এখনও তাই বলে)। এক প্রকাশকের পাঠ্য বই নিয়ে স্কুলে ও ইণ্টারমিডিয়েট কলেজে ঘুরতে হবে—পাঠ্য করার চেষ্টায়। একমাসের মতো কাজ।

সেটা বৈশাখ মাস তখন। ওদেশে গরমের মুখেই সেসন শেষ হয়। গরমের ছুটির পর নতুন ক্লাসের শুরু। ঐ কাজ নেওয়ার মূলে আসল টানটা

ছিল বাল্যের বহু স্মৃতি-জড়িত কাশীর এবং সে কাশীর মধ্যে আবার ঠাকুর্দার টানটাই বেশী। কৌতূহলই, টান বলা হয়ত ভুল হবে—কেমন আছেন তিনি, ঠিক সেই রকমই কি ? আদৌ আছেন কিনা তাই বা কে জানে !

গিয়ে দেখলাম—আছেন, তবে সে মানুষ আর নেই। ভেঙ্গে পড়েছেন একেবারে। আর একদমই খাটতে পারেন না। সারা জীবন দেহটাকে অবহেলা ক'রে এসেছেন, দেহ তার শোধ তুলছে এবার। বয়সও অবশ্য ঢের—ঠাকুর্দা নিজেই বলেন পঁচাত্তর ছিয়াত্তর। সেই সঙ্গে এও বলেন যে আরও বেশী হতে পারে। বয়সের নির্ভুল হিসেব তাঁর নেই। বাবা জানতেন, তা বাবার সঙ্গে তো দীর্ঘকাল—পঞ্চাশ বছরেরও বেশী ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে—জন্মদিন বা মাস বছর কিছুই জানার উপায় নেই।

সেই বাড়িতেই আছেন, লক্ষীবাবুর সেই ঘরে। কোথায়ই বা যাবেন। চাকরি বাকরি আর করতে পারেন না, সে কয়লার দোকানও উঠে গেছে। উনি ছেড়ে দিতে ভবানীদাও দোকান তুলে দিয়ে উত্তর কাশীতে চলে গেছেন, সন্ন্যাস নেবার মতলবে।

এবার দেখলাম সতীদিই সোজাসুজি সংসারের ভার নিয়েছেন। কোথায় একটা ঠিকে রান্নার কাজ করেন, সকাল ছটায় চলে যান, নটা সাড়ে নটায় ফেরেন। আবার বিকেলে পাঁচটায় যেতে হয়—ফিরতে রাত আটটা সাড়ে আটটা। শুকো দশ টাকা মাইনে। এতে ক'রে ওঁর অন্য বাড়তি কাজ অনেক কমিয়ে দিতে হয়েছে—যজ্ঞিবাড়ির বা পূজোআর্চার কাজ। কিন্তু উপায়ও নেই। অনিশ্চিতের ওপর ভরসা ক'রে বসে থাকা যায় না—একটা বাঁধা আয় দরকার। আগে তবু—যত কম মাইনেই হোক—ঠাকুর্দার চাকরি একটা ঠেকো ছিল—একটা ভরসা। এখন আর এ ধরনের কাজ নেওয়া ছাড়া উপায় কি ? তবু তো এটা পেয়েছেন। বেশির ভাগই দিনরাতের লোক চায়। যেখানে কাজ করছেন তাদের লোক কম, স্বামী আর স্ত্রী, খাওয়ারও তেমন কোন ঝঞ্ঝাট নেই।

ঝঞ্ঝাট দেখলুম সতীদির বাড়িতেই বেশী। কাজ আগের থেকে অনেক বেড়েছে। ওখান থেকে ফিরে রান্না করতে হয়, বাসনমাজা থেকে শুরু ক'রে ঘরের যাবতীয় কাজ তো আছেই—তার ওপর চেপেছে স্বামীর পরিচর্যা। ঠাকুর্দা ইদানীং একটু যেন অথর্বই হয়ে পড়েছেন। ভোরে উঠে কোমরে তেল মালিশ ক'রে দিলে তবে বিছানা ছাড়তে পারেন। সতীদি শীতের দিনে সকাল বেলাই বাগানে গামছা চাপা দিয়ে এক বালতি জল রেখে যান। সেটা রোদে গরম হয়ে থাকে। কে বলেছে রৌদ্রপক্ক জলে স্নান করলে শরীরে বল হয়—তাই এ ব্যবস্থা। বাইরে থেকে এসে উনুনে আঁচ দিয়েই বুড়োকে তেল মাখিয়ে স্নান করিয়ে দিয়ে নিজে কাপড় কেচে বা স্নান ক'রে নেন—যেদিন যেমন।

এই স্নানটার পর বৃদ্ধ অনেকটা চাঙ্গা হয়ে ওঠেন। খুটখাট একটু ঘুরেও আসেন কোন কোন দিন, এর কাছে ওর কাছে। বাজার যেতে হয় না—চাকরি সেরে আসার পথেই যা হোক একটু আনাজ কিনে আনেন সতীদি ছু এক পয়সার। দৈবাৎ কোনদিন সিধে পেলে তো কথাই নেই, তাতেই দু'তিনদিন চলে, তবে সেটা আজকাল দৈবাৎই হয়ে উঠেছে। উনি বাঁধা পড়েছেন, যুগের হাওয়াও পালটেছে।…

কাশীর টানটা বেশী ছিল বলেই ওটা শেষের জন্যে রেখে দিয়েছিলুম। ধরে ছিলুম আগ্রা থেকে, ওদিকের শহরগুলো সারতে সারতে কাশী পৌছলুম। এখানে চার পাঁচদিন বিশ্রাম নিলে ক্ষতি নেই। কাজের কথা যা, কোম্পানীকে লিখে দিয়েছি—আমার কর্তব্য শেষ।

এঁদের বর্তমান অবস্থার কথা কাশীতে পৌছে অনেকের মুখেই শুনেছিলুম। তাই দুদিনই দেখা করতে গেছি একটু বেলা ক'রে—নটা নাগাদ। বসে গল্প ক'রে এগারোটা সাড়ে এগারোটা নাগাদ হোটেলে ফিরেছি। দ্বিতীয় দিন সতীদি জোর ক'রেই একগাল ভাত খাইয়ে দিলেন। ওঁর হাতের অমৃততুল্য রান্না—না-ও বলতে পারলুম না।

মাসখানেক ধরে হোটেলে খাচ্ছি, ওঁর টক দেওয়া মটর ডাল, বেগুন ভাজা আর পোস্তচচ্চড়ি খেয়ে মুখটা ছাড়ল।

সেদিন আসবার সময় সতীদি চুপি চুপি একটা অনুরোধ করেছিলেন, 'যদি এর মধ্যে সময় পাস ভাই—বিকেলে এক-আধদিন আসিস্ একটু। আমি পাঁচটায় বেরিয়ে যাই—সারা সন্ধ্যেটা বুড়ো একা বসে হাপু গেলে। এত পড়ার শখ—তা চোখে তো ভাল দেখতে পায় না আজকাল, দুপুর ছাড়া ছাপার হরফ পড়তে পারে না। আমি বেরোতেও দিই না—চোখে কম দেখে, তাছাড়া বিকেলের দিকটায় কেমন যেন জবুথবু হয়ে পড়ে—একা বেরিয়ে কোথায় এক্কা চাপা পড়বে কি টাঙ্গায় ফেলে দেবে, আজকাল আবার রিক্সা হচ্ছে—বড় ভয় করে।...শরীরটা ওর একেবারে ভেঙ্গেছে। তাও এই গরমের দিনে দেখছিস, তবু একটু মানুষের মতো—শীতে যেন জন্তু হয়ে যায় একেবারে। এ ঘরটাও হয়েছে তেমনি তিনদিক বন্ধ, এক এই পুবদিক খোলা, সকালে যা একটু রোদ আসে—কিন্তু সে তো এই দালানটুকু। ঘরে তো যায় না একফোঁটাও। দুপুর-বেলা ঐ বাগানে গিয়ে বসে থাকে—আমি আবার ঘরে তুলে দিয়ে কাজে যাই—।'

বলতে বলতেই গলার আওয়াজ ভারী হয়ে এল সতীদির।

'তাই তো নিত্যি মা অন্নপূর্ণাকে জানাই, বুড়ো যেন আমার কোলে যায়। নিজের বৈধব্য কামনা কেউ করে না, কোন হিন্দুর মেয়ে করে না অন্তত—কিন্তু আমি করি। আমি জানি আমার দিন একরকম ক'রে কেটেই যাবে—আমি গেলে বুড়োর হাড়ির হাল। ঐ অথর্ব মানুষ, পয়সার জোর নেই, মেজাজও ভালো নয়, খারাপ রান্না একটু মুখে রোচে না—কে দেখবে ওকে ?...তোরা বল্ একটু, বাবা বিশ্বনাথকে জানা—আমার এই প্রার্থনাটুকু যেন শোনেন।'

তাঁর কথামতোই একদিন সন্ধ্যের একটু আগে গিয়ে পড়ম। ছটালু

বেজে গেছে তখন, সতীদি কাজে চলে গেছেন অনেকক্ষণ। বৃদ্ধ বাইরের বারান্দায় দেওয়ালে ঠেস দিয়ে সেই জলচৌকিটার ওপর বসে, পাশে লম্প হুঁকো আর সাজানো চার পাঁচটা কল্‌কে। বুঝলুম সতীদিই সব গুছিয়ে রেখে গেছেন—না উঠে খুঁজতে হয়। বোধহয় এই চৌকিটাও পেতে নিজে সযত্নে বসিয়ে দিয়ে গেছেন।

ঠাকুর্দা আমাকে দেখে মহাখুশী। বললেন, 'হ্যা— —। বললে বিশ্বাস করবি নি, বসে বসে তোর কথাই ভাবছিলুম। ভাবছিলুম যদি এসে পড়তিস তো ভাল হ'ত। বোস্ ভাই বোস্—কোথায়ই বা বস্‌বি—ছাখ ঐ ওদিকে একটা টুল আছে বোধহয়, খুঁজে পাস কিনা—'

'থাক থাক, আপনি ব্যস্ত হবেন না। টুল তো এই সামনেই রয়েছে। বসছি আমি।'

ব্যস্ত হয়ে বৃদ্ধ নিজেই উঠতে যাচ্ছিলেন, আমি জোর ক'রে আবার বসিয়ে দিলুম। তারপর একথা সেকথা—খুচরো আলাপ হ'ল কিছু। আমি কতদিন আর থাকব কাশীতে, ভালরকম একটা চাকরি-বাকরির কতদূর, দাদাদের বিয়ের কোন কথা হচ্ছে কিনা—এই সব।

সাধ্যমতো সংক্ষেপে উত্তর দিয়ে আমি আমার কথাটা তুললুম, ক'দিন ধরেই মনের মধ্যে যে প্রশ্নটা প্রবল হয়ে আছে। আগেও দেখে গেছি—তবু সার্থকনামা সতীদির এখনকার স্বামী-সেবার বোধকরি কোন তুলনা নেই কোথাও। পুরাণের সতীও এই স্বামীর এমন সেবা করতে পারতেন কিনা সন্দেহ। শিবের মতো স্বামীর জন্যে দেহত্যাগ করা কি অপর্ণা হয়ে তপস্যা করার অর্থ বোঝা যায়—রমেশ ঠাকুর্দার কি আছে? না রূপ, না গুণ, না বিদ্যা—না আর্থিক সঙ্গতি।

সেই কথাটাই তুললুম সরাসরি। বললুম, 'আচ্ছা ঠাকুর্দা, সতীদির এত প্রেম কিসের? কী দেখে এত মজে ছিলেন যে, এখনও সেই প্রথম প্রেমের নেশা কাটে নি—এখনও তাতেই মশগুল হয়ে আছেন!'

প্রশ্নটা ভারি ভাল লাগল ঠাকুর্দার। ঐ মুখচোখও আনন্দে যেন উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। খুব খানিকটা হাসলেন দন্তহীন মুখে হ্যা—হ্যা—হ্যা ক'রে। তারপর মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে বললেন, 'হুঁ—হুঁ বাবা, এর অর্থ আছে। অমনি কি হয়। অর্থ আছে!'

'সেই অর্থটা কি তাই তো জানতে চাইছি।'

'প্রেম কি এমনি হয় রে। মেয়েরা পীরিতে পড়ে পুরুষ দেখে। অর্জুনের পেছনে অতগুলো মেয়ে ঘুরেছিল কেন? দেখতে তো কালো ভূত ছিল। অবিশ্যি হ্যাঁ, মদ্দাটে মেয়েছেলে যারা—তারা একটু মেয়েলি ধরনের বেটাছেলে পছন্দ করে। তবে সে আর ক'টা?'

'তা আপনার ঠাকুর্দা খুব পৌরুষ ছিল বলে তো মনে হয় না। আপনিই তো বলেন শরীর আপনার কখনও তেমন ভাল ছিল না—কতকটা চিররুগ্ন। আর চেহারা তো এই—তালপাতার সেপাই!'

'হুঁ—হুঁ—তবু ও বৌ আমার বীর্যশুল্কেই জিতে নেওয়া। হয় না হয়, তোর ঠানদিকেই জিজ্ঞেস ক'রে দেখিস!'

'বীর্যশুল্কে জেতা? আপনার? সে আবার কি?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করি।

'হুঁ-হুঁ' 'হুঁ-হুঁ' ক'রে কৌতুকের হাসি হাসেন ঠাকুর্দা। মনে হয় অনেক দিন পরে ভারি রস পেয়েছেন মনে মনে। কোন দূর মধুর স্মৃতি সেই অতীতের বর্ণময় ইতিহাস বয়ে এনেছে আমার প্রশ্নে। আনন্দের দখিনা বাতাস বইয়েছে।

'ঐ তো বাবা, ভাবছ বুড়োটা চিরকালই এমনি ছিল। হুঁ-হুঁ! হুঁ-হুঁ!'

দুলে দুলে ঘাড় নেড়ে নেড়ে হাসেন রমেশ ঠাকুর্দা।

আমি টুলটা কাছে টেনে এনে—যাকে বলে দৈহিক অর্থেই—চেপে ধরি ওঁকে। দুই হাত ধরে বলি, 'ব্যাপারটা কি একটু খুলে বলুন ঠাকুর্দা, দোহাই আপনার—দুটি পায়ে পড়ি!'

'এই ছাখো, পাগল কোথাকার। এর জন্য আবার এত ব্যগত্তা করারই বা কি আছে। বলব না কেন—বলতে কোন বাধা তো নেই, কোন অসৎ কাজ তো করি নি। আর কে-ই বা জানতে চাইছে এ কথা, এর দামই বা কি। এক পথের ভিখিরী বুড়ো মুখ্যু বামুন আর তার এক পাগল বামনীর গল্প—এই তো!'

তারপর ওরই মধ্যে একটু সোজা হয়ে বসে একবার গলা-খ্যাকারি দিয়ে নিয়ে আরম্ভ করলেন ঠাকুর্দা তাঁর কাহিনী।

॥ ১০ ॥

'মটরাকে তো জানিস। পাঁড়ে হাউলীর মটরা?···তুইই তো বলছিলি না সেদিন তার কথা? বিয়োলো বোনটাকে ক'টা টাকার জন্যে সাধুর কাছে বেচে দিয়েছিল—সাধুটা ভাল তাই মেয়েটা বেঁচে গেল, খান্‌কী খাতায় নাম লেখাতে হ'ল না।···মটরাটা ছিল পুরুষ বেশ্যা, আগে মদনপুরার এক অল্পবয়িসী মহাজনের কাছে যাতায়াত করত—সে ছোকরার দেদার পয়সা, বাপের মস্ত কারবার বেনারসী শাড়ির, খুব পয়সা যোগাত। তারপর সে অন্য ছেলে একটাকে ধরলে, তাতেই মটরার অত হাত-খাঁকতি, পয়সার জন্যে হন্যে হয়ে বেড়াত, নেশার পয়সায় টান পড়লে আর কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকত না।

'যাক গে, যা বলছিলুম, মটরাকে কে প্রেথম বকায় জানিস? তুলসে গুণ্ডা। যখন খুব ছোট, একরত্তি ছেলে—তখনই ওর বারোটা বাজিয়ে দেয় একেবারে। পঞ্চরঙের নেশায় পাকা ক'রে ছেড়ে দেয়। তুলসেও বামুনের ঘরের ছেলে, কিন্তু সে বেটা ছিল মহা বদ। অমন সাংঘাতিক লোক, অত অল্প বয়সে অত বদ আমি আর ছুটি দেখি নি। মেয়েছেলের কারবারই ছিল ওর প্রেধান আয়ের রাস্তা। বিশ্বনাথের শিঙ্গারের দিন কি

শিবরাত্রির দিন, মানে রাত্তিরে যে দিন ভীড় হবে—সেই সব দিনে দেদার মেয়ে চুরি করত ও, ঐটেই ছিল যাকে তোরা বলিস এস্‌পেসালিটি।

'অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল বেটার, তা মানতেই হবে। ঐ তো দেখেছিস বিশ্বনাথের গলি—সরু গলিতে অমন হাজারো লোক—তারই মধ্যে, অতগুলো লোকের চোখের সামনে দিয়ে, চোখের নিমেষে উধাও ক'রে নিত। ছ্যাখ ছ্যাখ—আর ছ্যাখ! আশপাশে যেসব বাড়ি আছে, মন্দিরের দরজা—পিছু নিয়ে এসে ঠিক মওকা পেলেই ঢুকিয়ে দিত। দলের লোকরা ঠিক মোক্ষম জায়গাটিতে খাড়া থাকত, প্রত্যেককে মোটা মোটা টাকা দিয়ে হাত ক'রে রাখত—পূজুরী পাণ্ডা থেকে শুরু ক'রে চাকর দারোয়ান, যেখানে যেমন।

'এই সব মেয়েছেলে নিয়ে বেশির ভাগ সাধু মোহান্তদের সাপ্লাই করত তুলসে। নতুন ঘোড়াকে ব্রেক করায় জানিস? মানে প্রেথমটা তো বুনো থাকে—বাগ মানতে চায় না, লাগামের ইশারা বোঝে না। সেই সব শিখিয়ে পড়িয়ে বাগ মানিয়ে নেওয়াকে বলে ব্রেক করা। তুল্‌সেও অমনি দিনকতক কাছে রেখে ব্রেক ক'রে বাইরে বেচত। বড় বড় মোহন্তরা সব, গেরুয়া পরে থাকেন, বিয়ে করতে নেই, মেয়েমানুষের বাড়ি যাবেন সে উপায়ও নেই—জানাজানি হয়ে যাবে; ধর, কেউ গেরুয়া পরে ডাল্‌কামণ্ডীতে যাচ্ছে—চারিদিকে তো হৈ হৈ পড়ে যাবে! অথচ ওদের এত পয়সা—এত সুখে ভোগে থাকে—প্রিবৃত্তি খারাপ হওয়া স্বাভাবিক। সবই ভোগ হচ্ছে যেকালে—মানুষের যেটা সবচেয়ে বড় ভোগ সেটাই বা বাদ থাকে কেন? ওদেরই ঝোপ বুঝে কোপ মারত তুলসে। টাকার অভাব নেই তো। মোটা টাকাই দিত। গোপনে, কেউ জানতে পারবেনা, কেচ্ছা কেলেঙ্কার হবেনা—এমন ভাবে সবাই দিতে পারেনা, তুল্‌সে পারত।'

একটু থেমে—আমার তাড়নায় খেই-হারিয়ে যাওয়া সূত্র আবার খুঁজে নিয়ে—কাহিনীটা পুরোপুরিই বললেন ঠাকুর্দা।

তুলসে নাকি এ লাইনে একেবারে চোস্ত ছিল। পুলিসের বড় সাহেব থেকে শুরু করে—যাকে যাকে পূজো দেওয়া দরকার সবাইকে টাকা দিয়ে জমিয়ে রাখত। কেউ কিছু দেখেও দেখত না তাই। নইলে চারদিকে পুলিশ পাহারা—শিঙ্গারের দিন বিশেষ ক'রে—তার মধ্যে থেকে দুটো তিনটে মেয়ে পাচার করত তুলসে ফি বছর। এর মধ্যে কিছু কিছু বাইরেও চালান দিত। এ কারবার অনেকেই করে—বিহারে, পাঞ্জাবে, ভূপালে বহু এমন কারবারী আছে—তাদের অনেকের সঙ্গেই নাকি ওর যোগাযোগ ছিল।

রীতিমতো কারবার যাকে বলে। দেখতে দেখতে ডাক-বদলের মতো হাত-বদল হয়ে বহু দূরে চলে যেত। বাঙ্গালীর মেয়ে কাবুল বাসরা আফ্রিকা আরব থেকে শুরু করে ওদিকে আরাকান বর্মা পর্যন্ত চলে যেত—কোথায় কোথায় না ছিল ওর লোক—মেয়েগুলো ইহজীবনে আর দেশভুঁই আত্মীয়-স্বজনের মুখ দেখতে পেত না।···

হাজার হাজার টাকা নাকি রোজগার করত তুলসে ওই কাজ ক'রে। এমন ব্যাপার—অনেক ভালোমানুষ ভদ্র লোকও ওকে প্রশ্রয় দিত, বিপদ আপদ সামলাত। হীরু কাঁসারীও তার ভেতর একজন।

হীরু কাঁসারী! নামটা শুনে আমিও চমকে উঠেছিলুম। সে এর মধ্যে? তাকে তো ভাল লোক বলেই জানতুম। দান-ধ্যান ঢের, যথার্থ পরোপকারী—প্রতাপও খুব, কাশীর তাবড় তাবড় লোক হীরুর কথায় ওঠে-বসে, খোদ অন্নপুর্ণার মোহান্ত ওর বন্ধুর মতো—অথচ সে-ই নাকি চিরকাল তুলসেকে মদৎ দিয়ে এসেছে। সময়ে অসময়ে টাকা দিয়ে, বিপদে আপদে ওপরওলাদের ধরে তাল সামলেছে।

'আসলে টাকা'—ঠাকুর্দা বল্লেন, 'আমার যা মনে হয়। তুল্‌সের কারবারে ওর ভাগ ছিল নিশ্চয়, এই দিকটা দেখত কারবারের—কিছু কিছু ভাগও পেত। টাকার জন্যে মানুষ কী না পারে!

'যাকগে মরুকগে—কার ভেতর কি আছে কেউ বলতে পারে না।

ঠিক না জেনে কাউকে দোষ দেওয়া উচিত নয়। যা বলছিলুম, তুল্‌সের কথা। রোজগার করত ঢের, তেমন তেমন মাল পেলে এক চালানেই পাঁচ-সাত-দশ হাজার পর্যন্ত লুটে নিত—কিন্তু এসব রোজগারের টাকা তো থাকে না। ঐ যে বলে না—চিংপাতের ধন উৎপাতে যায়—কথাটা খাঁটি সত্যি। তাছাড়া ওর খরচও ছিল ঢের, নিজের নেশাভাঙ তো ছেড়েই দাও; বাঁধা মেয়েই ছিল দুটো,—এমনি মাইনেকরা লোকও পুষতে হ'ত একগাদা। ঐ দেঁড়শিকে পুল—ওর কাছেই—একটা গোটা বাড়িই ভাড়া করা ছিল তুল্‌সের, বাইরে থেকে তালা-চাবি দেওয়া, জানলা বন্ধ—যাতে দেখলে মনে হয় পোড়ো বাড়ি—তার ভেতর চাকর ঝি বাঁধা গুণ্ডা, এক গাদা লোক থাকত। রীতিমতো একটা—ঐ যে কী বলিস তোরা—এস্টাবিলিশমেণ্ট।'

আমি চুপ ক'রেই শুনছিলুম—একটু বাধা দিতে হ'ল এবার। জিজ্ঞেস করলুম, 'দেঁড়শিকে পুল—মানে বিশ্বনাথের গলি? এক্কাওলারা তো ঐ অব্‌দি যায়। আজকাল রিক্সা হয়েছে তারাও বলে দেঁড়শিকে পুল, কিন্তু যায় তো দেখি ঐ বিশ্বনাথের গলির মোড় পর্যন্ত।'

'হ্যাঁ রে—ঐখানে যে সত্যিই পুল ছিল একটা। আসলে এখন যেটাকে তোরা দশাশ্বমেধ রোড বলিস, ওখানে একটা নদী ছিল। কাশীধামে যেমন তেত্রিশকোটি দেবতা আছেন, তেমনি সমস্ত তীর্থও। সর্বতীর্থময়ো কাশীঃ। ঐখানে যে নদী ছিল তাকে বলত গোদাবরী, মাড়ুয়াডী—ঐ যে এক্কাওলাগুলো চেঁচায় "মাড়ুয়াড়ি মাড়ুয়াডি "বলে—সেইখান থেকে সোজা এসে দশাশ্বমেধে পড়ত নদীটা। তখন ঐখানে মন্দিরে যাবার পথে—একটা পুল ছিল, তাকেই বলত 'দেঁড়শিকে পুল। সে বহুকালের কথা অবিশ্যি—আমিও সে নদী দেখি নি—শুনেছি। সে নদীও নেই, পুলও নেই কিন্তু নামটা থেকেই গেছে—দেঁড়শিকে পুল।

'এমন বহু জায়গা আছে। মণিকর্ণিকা যেতে যে বরমনালা পড়ে—

এখনকার যেটা চকথানা—তার সামনে দিয়ে সোজা যে গলিটা মণিকর্ণিকা পর্যন্ত চলে গেছে—ওখানেও একটা নদী ছিল, ব্রহ্মনালা বলে, কাশীখণ্ডে তার উল্লেখ আছে। এখন আর সে নদী নেই, নামটা আছে। মণিকর্ণিকা শ্মশানের ওপরদিকে যে জায়গাটা, তাকেই এখন ব্রহ্মনালা বা বরমনালা বলে। ওখানে পোড়ানোর ভারী কদর, তবে যাকে-তাকে পোড়াতে দেয় না। ওখানে পোড়াতে গেলে ম্যাজিষ্ট্রেটের হুকুম লাগে।'…

বলতে বলতে যেন একটা ঘোর লাগে তাঁর চোখে, চুপ ক'রে যান একটু, তারপর নিজেই আবার একটু হেসে প্রকৃতিস্থ হয়ে ওঠেন, 'ছাখ্—কোথা থেকে কোথায় চলে এলুম। কী যেন বলছিলুম, তুলসের ঐ আপিস বাড়ির কথা! আপিস বাড়িই বলতে হয়, আর কি বলব বল? বিশ্বনাথের গলির উল্টো দিকে যে ভূতেশ্বরের গলিটা—কামরূপ মঠের দিকে চলে গেছে, ওর যে দিকে লালগোলার বাড়ি, তার পেছনেই ছিল ঐ আড্ডা। যা বলছিলুম, এই সব নানা ব্যাপারে তুলসের হাতে টাকা কখনই জমত না। যত্র আয় তত্র ব্যয় হয়ে যেত। কাজেই কারবার চালু রাখতেই হ'ত। একবার ঐ শিঙ্গারের রাত্তিরেই এক উকীলের বৌকে সাফ করতে গিয়ে প্যাচে পড়ল। উকীলের বৌ কি কার বৌ তা তো আর জানে না। সুন্দর মেয়ে দেখেছে এই পজ্জন্ত, ওর যা দরকার। সে উকীলটা খুব বুদ্ধিমান। সে প্রেথমটা একটু খোঁজাখুঁজি করার পর পাণ্ডাদের বাঁকা হাসি দেখেই ব্যাপারটা বুঝে নিল। আর একদম সোরগোল করে নি, ছুটোছুটি চেঁচামেচি পুলিশে খবর দেওয়া—কিচ্ছু না। সেও টাকা ছাড়তে লাগল। টাকায় কি না হয়। পাণ্ডাদের টাকা খাওয়াতেই খবর বেরোল। তার থেকে ওর চেলা-চামুণ্ডাদেরও হদিস পাওয়া গেল, তাদের কিছু খাওয়াতেই সব খোঁজ মিলল।'

তখন সে উকীলবাবু নাকি থানায় গেলেন। সেখানে গিয়ে পরিচয়

দিলেন—এলাহাবাদের পুলিশ সাহেবের ভাই,নিজেও বড় উকীল। পরিষ্কার বললেন, 'এ আমি সহজে ছাড়ব না, আপনারা যদি আমাকে সাহায্য না করেন—আপনারাই বিপন্ন হবেন।' অগত্যা তাদের দলবল নিয়ে বেরোতে হ'ল—আর চোখ বুজে বসে থাকতে পারল না। উকীলবাবু পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল ঐ বাড়িতে। ঠাকুর্দা বললেন, 'বাড়িটা থেকে বেরোবার পথ ছিল তুটো। ছাদের পাঁচিল ডিঙ্গিয়ে পাশের বাড়ি থেকেও নামা যেত। সে সব খবর নিয়ে উকীলবাবু আগেই সেখানে লোক মোতায়েন রেখেছিল। একেবারে যাকে বেড়াজাল বলে। পুলিশ গিয়ে দোর ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকে দেখল, চারতলার একটা ঘরে মেয়েটাকে মাজম্ খাইয়ে অজ্ঞান ক'রে ফেলে রেখেছে। অত্যোচারের চিহ্ন স্পষ্ট।

'এমনই কপাল তুলসের, সেদিন সেও ওখানে ছিল। খাপসুরৎ মাল পেয়ে আর লোভ সামলাতে পারে নি—নইলে তার তখন তু নম্বর মেয়েমানুষের বাড়ি লঙ্কায় থাকবার কথা। হাতে-নাতে ধরা পড়া যাকে বলে। সে বিরাট মকদ্দমা হয়েছিল। তুলসেকে বাঁচাবার জন্যে কম চেষ্টা করে নি ওর পেট্রনরা,-হীরু কাঁসারী নাকি হাজার হাজার টাকা খরচ করেছিল। কিন্তু উকীলবাবুও জবরদস্ত লোক, সাক্ষী প্রমাণ এমনভাবে সাজিয়ে ছিলেন যে কোন হাকিমই তারপর খালাস দিতে পারে না। ঐ বাড়িতে যারা এতকাল তুলসের নিমক খেয়েছে—তাদের দিয়েই, কাউকে ঘুষ দিয়ে, কাউকে ভয় দেখিয়ে সাক্ষী দেওয়াল। সমস্ত কুকীর্তির কথা বেরিয়ে গেল তাদের মুখ থেকে—কাগজে কাগজে লেখালেখি। হয় একগুণ তো লোকে বলে দশগুণ তা তো জানিসই। সে এক বিচ্ছিরি ব্যাপার। নিহাৎ এদের তরফ থেকেও খুব তদ্বির হয়েছিল বলে অল্পে অব্যাহতি পেলে—চার বছরের জেল হয়ে গেল তুলসের।'…

এই পর্যন্ত বলে ক্লান্ত হয়ে চুপ করলেন ঠাকুর্দা।

অনেকক্ষণ বসে রইলেন চোখ বুজে। তারপর কেমন যেন অসহায় ভাবে প্রশ্ন করলেন, 'হ্যাঁ, কী বলছিলুম যেন—?'

খেই ধরিয়ে দিতে আবার শুরু করলেন বলতে।

জেল থেকে বেরিয়ে এসে আর এসব কাজে নামতে সাহস করে নি তুলসী। পুলিশের ভয় তো আছেই—তাছাড়া দলবল যারা ছিল, তারা এদিকে ওদিকে ছিটকে গেছে—নিজের নিজের মতো ক'রে খাচ্ছে। তাদের কেউ-ই আর ঘেঁষ দিল না তুলসেকে। যে সব পেট্রনরা টাকা যোগাত এত কাল—হীরু কাঁসারীর মতো লোক, তাদেরও শিক্ষা হয়ে গেছে। কাগজে ওদের নাম বেরিয়েছিল। যদিও ধরা-ছোঁয়ায় ফেলতে পারে নি বলে কোনমতে বেঁচে গিয়েছিল—'তবু ভাল ঘোড়ার এক চাবুক' ঠাকুর্দার ভাষায়, ওদের চৈতন্য হয়েছিল ঐ একবারেই। তারা আর কেউ ওর সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে রাজী হল না। হীরু কাঁসারীর সঙ্গে রাস্তায় দেখা হ'লে নাকি চিনতে পারে নি, মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চলে গেছে। এমনকি পুরনো মেয়েমানুষদের কাছে গিয়ে জানল—তারাও অন্য বাবু ধরেছে। কী করবে, তাদেরও তো চলা চাই।

তুলসেরও আর কোন পথ ছিল না রোজগারের—খারাপ পথ ছাড়া। লেখাপড়া শেখে নি যে চাকরি-বাকরি করবে, বামুনের ছেলে পূজোপাঠ ক'রে খাবে— কে দেবে ঐ নামজাদা খুনে গুণ্ডাকে ঠাকুরের পূজো করতে! আর যে এতকাল নবাবী ক'রে এসেছে সত্যিই সে কিছু মুটেগিরি ক'রে খেতে পারে না। ঠাকুর্দার ভাষায়, পাপে যে গলা পর্যন্ত নেমেছে—পাপের পথ ছাড়া তার কর্ম নয়। মানে সাধারণ মানুষের পক্ষে, বাল্মীকি একজনই হয়। সে হওয়া সহজ নয় বলেই তাঁর কথা সকলে মনে রেখেছে। তাঁর নাম প্রবাদ হয়ে গেছে। তাছাড়া তুল্‌সের মাথাটাই ছিল অন্যরকম—দৃষ্টিটা ছিল বাঁকা, সোজা পথ দেখতে পেল না কোনদিনই।

'এবার সে আরও জঘন্য পথ ধরল।' হুঁকোটা সাবধানে দেওয়ালে

ঠেসিয়ে রেখে বললেন ঠাকুর্দা, 'বিয়ে করব বলে গরিবের মেয়ে খুঁজে বার করতে লাগল। বাইরেকার মেয়ে সব—ধর, গোরখপুর ছাপরা কি বালিয়া জেলার ছোট শহর কি গ্রামে যে সব বাঙালী পরিবার আছে, তারা মেয়েদের বে দিতে পারে না। এক জায়গায় হয়ত ঐ এক ঘরই, সরকারী চাকরি নিয়ে গেছে। এমনিও জমিজমা নিয়ে থাকে—এমন অনেক আছে অনেক জায়গায়; ওসব দেশে মহকুমা শহরেই হয়ত মোট সাত-আট ঘর বাঙালী, তার মধ্যে দু-তিন ঘরের বেশি বামুন বেরোবে না, তাও আমাদের খিটকেল তো কম নয়— রাঢ়ী আছে, বারেন্দর আছে, শ্রোত্রীয়, বৈদিক, তার মধ্যে আবার দাক্ষিণাত্য বৈদিক—শুদ্ধ শ্রোত্রীয়—কত বলব? কাজেই পাত্তর পাবার জন্যে মাথা খোঁড়াখুঁড়ি। দেশভূঁই—নিজেদের জাতঘর থেকে অত দূরে কে ওদের জন্যে পাত্তর খুঁজবে? ফলে একো একো মেয়ে ছাখো বুড়িয়ে যাবার যোগাড় হয়, তবু বে হয় না।'

তুলসে চারদিকে লোক লাগিয়ে ঐসব মেয়েদের খবর নিতে লাগল। কোথায় কোন্ গ্রাম, স্টেশন থেকে হয়ত সতেরো আঠারো মাইল দূরে—বয়েলগাড়ি ক'রে যেতে হয়। সেখানে ঐ একটিই বাঙালী পরিবার আছে—সেইখানে লোক লাগিয়ে, অপরের জবানীতে চিঠি দিয়ে বিয়ের প্রস্তাব পাঠাতে লাগল। তারা তো একে চায় আরও পায়। কাশীতে নিজের বাড়ি আছে, ছেলে অর্ডার সাপ্লায়ের কাজ করে, চেহারা ভাল, সঘর—এর চেয়ে ভাল আর কি তারা আশা করবে—'খোট্টার দেশের' বাঙালী মেয়ে? বেশী খোঁজ-খবর নেওয়া তাদের সম্ভব নয়—আর সবচেয়ে বড় কথা, ঘাড় থেকে 'থুবড়ি' মেয়ে নামলেই তারা বাঁচে। খবর নিতে গেলে যদি বাগড়া পড়ে?

'চেহারাটা তুলসের সত্যিই ভাল—আর ভট্‌চায উপাধি তো—মেয়েদের ঘর বুঝে যেখানে যেমন, সেখানে তেমন হয়ে যেতে লাগল।

কোথাও রাঢ়ী, কোথাও বারেন্দর, কোথাও বৈদিক। ব্যস, কেল্লা ফতে। পাঁচ-সাতশ' হাজার টাকা নগদ, একগা গয়না, অন্য দান-সামি্‌গ্‌গির বিশেষ নিত না তুলসে, বলত—"আমাদের বামুনের ঘর। ওসব অঢেল, গোচ্ছার বাসন নিয়ে কি করব বলুন, আর খাট বিছানা? সেকেলে বাঙালীটোলার বাড়ি আমাদের, খুপরি খুপরি ঘর, মালে বোঝাই। ওসব রাখব কোথায়? তার বদলে বরং নগদ টাকাটা বাড়িয়ে দিন কিছু—"

'দিতও তারা, হাসিমুখেই দিত। ওসব দেশে যারা পড়ে আছে তাদের অবস্থা খুব খারাপও নয়। তুলসের যাকে বলে অর্ধেক রাজত্ব আর একটি রাজকন্যে লাভ হ'ত। দূর পথ বলে বেশী বরযাত্রীর কথা উঠত না, গুটি তিন-চার লোক নিয়ে বে করতে যেত, ভাড়া-করা লোক সব—তাদের গাড়ি-ভাড়া ছাড়া বিশ-পঁচিশ ক'রে দিলেই তারা কেদাত্ত হয়ে যেত—তুমাসের সংসার খরচ কাশীর। বে ক'রে এনে তু'চার দিন ঘর-সংসার করত। এক মা ছিল বাড়িতে—তাকে মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দিত এক একদিন—সে যমের মতো ভয় করত ছেলেকে—যা বলত, যেমন শাশুড়ীগিরি করতে বলত, তাই করত। আট দিন স্বোয়ামী সেজে থেকে শ্বশুরের খরচায় জোড়ে শ্বশুরবাড়ী ঘুরে আসার পথেই কোথাও বেচে দিয়ে আসত। খদ্দের সব রেডি—বিহারী, কাবুলী, পাঞ্জাবী, নেপালী—অনেক খদ্দের ছিল ওর। এ একটা আলাদা কারবার—এরও দালাল আছে, মহাজন আছে। কখনও "তার" ক'রে দিত—কলেরায় মরে গেছে, কখনও বা তাকে দিয়ে জোর ক'রে খানকতক চিঠি লিখিয়ে নিত, "অনেকদিন আপনাদের কুশল না পাইয়া চিন্তিত আছি" বাঁধা গৎ। যেন বাপের বাড়ির চিঠি একখানাও পায় নি—কি পাচ্ছে না। এই চিঠি মধ্যে মধ্যে ছাড়ত, তারাও নিশ্চিন্ত ছিল। অনেক সময় বৌকে নিজের বাড়িতেও তুলত না—বেশী বাড়াবাড়ি করলে জানাজানি হয়ে যাবে এই

ভয়ে। হয়ত সেই গৌরীগঞ্জে কি ময়দাগিনে কোন বাড়ি ভাড়া ক'রে সেখানে গিয়ে তুললে, তাদের হয় বললে কেউ কোথাও নেই, নয়ত বললে যার সঙ্গে বনে না তাই আলাদা—এইভাবে চালাত সকলের চোখে ধুলো দিয়ে।

'মহা ফন্দীবাজ আর ধূর্ত লোক ছিল তুলসে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। অনেক ভেবে সব দিকের আটঘাট বেঁধে কাজ করত। কিন্তু সবেরই একটা সীমা আছে, শেষ আছে। যত বড় ধড়িবাজ আর ধূর্তই হোক—পাপের পথের এমনই নিয়ম—এক সময় না এক সময় এক একটা ভুল ক'রে বসবেই।

'আসলে অহঙ্কার থেকেই এসব ভুল আসে বেশির ভাগ, ধর্ম কি আইনকে ফাঁকি দিতে দিতে বুক "বলে" যায়—ধরাকে সরা দেখে, ভাবে তাকে কেউ কোনদিন ছুঁতে পারবে না। এই-ই নিয়ম দুনিয়ার। ধর্ম কিছুদিন অপেক্ষা ক'রে দেখেন, মুখ বুজে সহ্য করেন, তারপর দুর্বুদ্ধি হ' তার ঘাড়ে চাপেন, তাকে দিয়েই তার সব্বনাশের পথ করেন। তুলসেরও হ'ল তাই। বাইরে বাইরে যদ্দিন ছিল এক রকম চলছিল। কারবার ফলাও হচ্ছিল দিন দিন। ছাপরার মেয়ে যে কলেরায় মরেছে একমাস আগেই—বালিয়ার মেয়ের বাপ—যে শহর-বাজার থেকে কুড়ি মাইল দূরে দেহাতী গাঁয়ে পড়ে আছে, তার জানবার কোন হেতু নেই। কাল হল তুলসের কাশীর মেয়ের দিকে হাত বাড়িয়ে।'

॥ ১১ ॥

অনেকক্ষণ বকে ঠাকুর্দা শ্রান্ত হয়ে পড়েছেন দেখে আমিই লম্পটা জ্বেলে একটা কলকে ধরিয়ে দিতে গেলুম, উনি তো হাঁ হাঁ ক'রে উঠলেন একেবারে।

'সর সর, ওসব তুই কি বুঝবি। তুই কলকে ধরালে সে তামুক আর আমাকে খেতে হচ্ছে না। এরসের রসিক না হ'লে চলে? জিনিসটাই মাটি করে বসবি! তোর ঠানদি কলকে সাজিয়ে রেখে দেয়—কিন্তু টিকে ধরাতে দিই না ওকে। তুই রাখ, আমিই ধরিয়ে নিচ্ছি।'

কলকে ধরিয়ে, আমি যে সন্দেশ নিয়ে গিয়েছিলুম তার দুটো গালে ফেলে জল খেয়ে কিছুক্ষণ নিঃশব্দে তামাক টানলেন। তারপর হুঁকো নামিয়ে নিজেই শুরু করলেন আবার।

'এই সময়টাই আমি কাশীতে এসেছি সবে, অত-শত কাশীর মহিমা কিছু জানি না। বলে খাই দাই কাঁসি বাজাই, অত রগড়ের কি ধার ধারি—-আমারও হয়েছে তাই। লক্ষ্ণৌ থেকে কাশী আসি যখন তখনও হাতে গোটা-দশেক টাকা আছে, তবে আমি খুব সেয়ানা হয়ে গিছলুম এতদিনে। এখানে এসে একটা দিন ধর্মশালায় থেকে হাতীকট্‌কার কাছে মাসে আট আনা ভাড়ায় একটা ঘর ভাড়া ক'রে নিলুম। রেঁধে খেতে পারি না—তখনকার দিনে হোটেলও তেমন হয়নি, দু' একদিন বাজারের খেয়ে পেট খারাপ হয়ে গেল, শেষে একজনকে ধরে পুঁটের ছত্তরে খাওয়ার ব্যবস্থা ক'রে নিলুম। এক বেলা ওখানে খাই আর এক বেলা যোগে-যাগে চালাই। তখন কাশীতে গরমের দিনে এক পয়সা সের খরমুজ। এক পয়সায় ছ' ডেলা মুঠী গুড়। এক পয়সা খরচ করলে তোফা খাওয়া। এক পয়সায় বেল কিনলে একা খেতে পারতুম না। শীতের দিনে ওসব ছিল না, তেমনি ঐ বিশ্বনাথের গলির মোড়ে

কচুরির দোকান—ওখানে এক পয়সা ক'রে এক-একখানা রেকাবির মতো কচুরি। দু' পয়সা খেলেই রাতটা চলে যেত। খেতুম আর গুধুড়ি বাজারে ঘুরে বেড়াতুম। পুরনো দু'একটা পুঁথি পেলে, দু'পয়সা চার পয়সায় যদি হত তো, কিনে নিতুম। নইলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে আসতুম। '

'তবে এভাবে চলবে না সেটা বুঝেছিলুম। কলসীর জল গড়াতে গড়াতে শেষ হতে বসেছে তখন। নতুন এসেই ক'টা বজ্জাত পাণ্ডা আর জোচ্চোরের পাল্লায় পড়েছিলুম। অবশ্য তাতে বেশী খসে নি—ওরাই আমার হিম্মৎ বুঝে ছেড়ে দিয়েছিল—তবু কিছু গেছে প্রেথমটায়।··· কাজেই রোজগারের চেষ্টায় মন দিতে হ'ল। অনেক ঘোরাঘুরি ক'রে দু' একটা টিউশনিও পেলুম। দু'টাকা এক টাকার টিউশনি, তাও সেটাকা আদায় করতে রক্ত-পাইখানা শুরু হয়।···আর উপায়ই বা কি? অবিশ্যি পূজো যজমানি না করলেও এসে অন্য একটা সামান্য রোজগারের ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছিল—একটা কোতোয়ালের কাজ পেয়ে গিয়েছিলুম।'—

আমি চমকে উঠলুম, 'কোতোয়াল? মানে পুলিশের কোতোয়াল? সে তো এস. পি-কে বলে?'

হো হো ক'রে হেসে উঠলেন ঠাকুর্দা।

'দূর বোকা! আমার কি সেই বিদ্যের জোর ছিল যে পুলিশের কোতোয়ালী করব! এ সে কোতোয়াল নয়।···আর বলবই বা কি? এখনকার ছেলেরা বোধ হয় কেউ-ই জানে না।···ওরে, এই যে কাশীতে এত অধিষ্ঠান দেখিস, অধ্যাপক-বিদেয় ব্রাহ্মণ-বিদেয়—এর একটা নেমন্তন্নর ব্যাপার তো আছে! সে এমনি যার যাকে খুশি করলে চলত না তখন। কাশীতে ব্রাহ্মণদের কতকগুলো সমাজ ছিল—এক এক পাড়ায় এক এক দল। অনেক রকমের ব্রাহ্মণ আছে—এই একটু আগেই তো বলছিলুম—তাদের আলাদা আলাদা সমাজ। এ ছাড়াও পাড়া ধরে ধরে আলাদা

আলাদা দলপতি ছিল, কারও অধিষ্ঠান দেবার ইচ্ছে হ'লে ঐ দলপতিকে আগে জানাতে হ'ত। শুধু ব্রাহ্মণের অধিষ্ঠান না অধ্যাপকের? শুধু বিদায় না বিচারসভা? ক'জন চাই, এ সব পরিষ্কার ক'রে জানিয়ে, তারিখটি বলে দিয়ে আসতে হ'ত। তারপর দলপতি ঠিক করতেন কোনদিন কাকে কাকে বলবেন। তিনি এক অনুগত ব্রাহ্মণ পাঠিয়ে এই নিমন্ত্রণ করতেন, ঐ ব্রাহ্মণকেই বলা হ'ত কোতোয়াল।'

'তা কোতোয়াল নাম কেন?' আমি শুধুই, 'এ রকম নেমন্তন্ন করার ব্রাহ্মণ তো আমাদের ওখানেও থাকে দু' একজন, ব্রাহ্মণ পাঠিয়ে সব জাতের লোক নেমন্তন্ন করা যায়, নিজেদের যেতে হয় না বলে ওঁদের ধরে। এক একজন খুব একটু এক্সপার্ট হয়ে ওঠেন—তাই তাঁদেরই ওপর ভার দেয় সকলে। কিন্তু কৈ, তাদের তো কোতোয়াল বলে না?'

'না, তা বলে না।' ঠাকুর্দাও সায় দিলেন, 'ওটা কাশীরই একচেটে। শব্দটা এসেছে বাদশাহী আমল থেকে। শুনেছি শাজাহান বাদশার বেটা দারা শুকোহ্ কাশীতে এসে ব্রাহ্মণ বিদায়ের অনুষ্ঠান ক'রে সভা ডাকেন, তিনি আর কাকে জানেন? তাই নাকি শহরের কোতোয়ালকে পাঠিয়ে ব্রাহ্মণদের নেমন্তন্ন করেছিলেন। সেই থেকেই ঐ শব্দটা চলে আসছে।···হ্যা— —,যা বলছিলুম, দলপতি তো ফর্দ ক'রে দিলেন, সেই ফর্দ নিয়ে কোতোয়াল বেরোল জানান দিতে। কাকে কাকে নেমন্তন্ন করা হচ্ছে কোতোয়ালই চিনে রাখত—কোন ব্রাহ্মণ হয়ত নিজে যেতে পারবেন না, ছেলেকে পাঠাবেন—ছেলেকে ডেকে কোতোয়ালকে চিনিয়ে দিতেন।···অধিষ্ঠানের দিন কোতোয়াল সেই বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে থাকত—চিনে দেখে গৃহস্বামীকে পরিচয় করিয়ে দিত। তিনি অভ্যর্থনা ক'রে ভেতরে নিয়ে যেতেন।···বাবা বিশ্বনাথের দয়ায় কৈলেসদা—কৈলেস শিরোমণি মশাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে গেল। আমাদের সমাজের লোক, কথায় কথায় পরিচয়ও

বেরিয়ে গেল—তখন ওঁরও পুরনো কোতোয়াল নেই। তিনি আমাকে কোতোয়াল ঠিক করলেন। ওঁর দলের লিস্টি দিয়ে ঠিকানা দিয়ে বলে দিলেন—ঘুরে ঘুরে সকলকে চিনে আসতে।'

'তা বেতন কত ?' জিজ্ঞেস করলুম আমি।

'দূর পাগল, বেতন কি রে! দলপতির কি ঘরে মোটামুটি কিছু আসত যে মাইনে দেবেন? বরং কোতোয়ালেরই কিছু বাড়তি পাওনা ছিল, অধিষ্ঠান যা দেওয়া হ'ত কোতোয়াল তার ডবল পেত। আর পাওয়াই বা কি—অধিষ্ঠান—ব্রাহ্মণের অধিষ্ঠান বেশির ভাগ বাড়িতেই দেওয়া হ'ত একটা মাটির খুরিতে ছোট এক কুঁদো মিশ্রী, একটা পৈতে আর রুপোর দোয়ানি বা সিকি। কুঁদো মানে—এখানে যে ফেনি বাতাসার মতো মিশ্রীর কুঁদো হয়—সেই। আমাদের দেশের মতো বড় তাল মিশ্রী নয়।

'অধ্যাপক বিদেয় হ'লে আর একটু ভাল ব্যবস্থা হ'ত। পেতলের সরা বা রেকাবি—যার যেমন সামর্থ্য, মিশ্রীর বদলে হয়ত দুটো কি চারটে সন্দেশ, দক্ষিণেও চার আনার কম নয়। আধুলিও দিত কেউ কেউ। চৌখাম্বার মিত্তির বাড়ি—ঐ যে যাদের সোনার দুগ্‌গোমূর্তি—ওখানে ব্রাহ্মণদের অধিষ্ঠানেও মিশ্রীর বদলে একটা ক'রে চুড়ো সন্দেশ দেওয়া হ'ত। ...তবে এসব কি আর কেউ পাওয়ার জন্যে যেত? অধিষ্ঠানে নেমন্তন্ন হওয়া একটা সম্মান। যাবেন, গৃহস্বামী পা ধুইয়ে মুছিয়ে দেবে নতুন গামছায়, বসবেন—মানে ব্রাহ্মণের অধিষ্ঠান হবে তাঁর বাড়িতে। এই থেকেই অধিষ্ঠান কথাটা এসেছে, আশীর্বাদ ক'রে বিদায় নিয়ে চলে আসবেন, কাজ তো এই। কোতোয়ালের পাওনা ছিল খুরি হ'লে দুখানা খুরি, সরা হলে দুটো সরা—ভেতরের সাজপাট সমেত। তবে কি, তেমন ঘটার কোন ক্রিয়াকলাপ কি শ্রাদ্ধশান্তি হ'লে, পূজো-টুজোয়—এইসব কোতোয়ালদের ধুতি-চাদর পাওনা হ'ত।...ও কাজ কি আমার পাবার কথা? নেহাৎ কৈলেসদা স্নেহ করতেন বলেই—'

কথাটা বলতে বলতেই কেমন যেন আত্মস্থ হয়ে যান রমেশ ঠাকুর্দা। বোধ হয় অতীতের কথা মনে পড়ে সেই স্মৃতির অতলে তলিয়ে যান কিছুক্ষণের জন্যে। তারপর অল্প দু'এক মিনিট পরেই আবার যেন চমক ভেঙ্গে বাস্তবে ফিরে আসেন।

'বেশ ছিলুম, বুঝলি, বে-পরোয়া, খাওয়ার জন্যে চিন্তা নেই, ভবিষ্যতের ভাবনা নেই—স্বাধীন। ক্রেমে ক্রেমে আরও দু' একটা ছেলে পড়ানো জুটল, ক্রমশ মাসে পাঁচ ছ' টাকার মতো আয় দাঁড়িয়ে গেল। আরও হতে পারত—তখন তো এখানে বাংলা ইস্কুল ছিল না। অনেকেই মাষ্টার খুঁজত—কিন্তু আমার অত লোভ ছিল না। দরকারের বেশী রোজগার করব—তার জন্যে সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত ভূতের মতো খাটব—ও আমার ধাতে সইত না। অত পয়সার টান থাকলে দেশের বাঁধা যজমানী ছাডব কেন ?···আর সত্যি কথা বলতে কি, নিজের আখের, ভবিষ্যৎ, কি নিজের দু' পয়সা আয় কিসে বাডবে, এ কোন দিনই ভাবি নি, ঐ চিন্তামণি মুখুজ্জে যখন বাংলা ইস্কুল খুলতে এল—আমি ওর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে পয়সা ভিক্ষে করেছি—একথা একবার মনেও হয় নি যে বাংলা ইস্কুল হ'লে সেখানেই সকলে ছেলেকে দেবে—আমার টিউশনির দ[illegible] গয়া হয়ে যাবে।

'যাকগে, মরুকগে—আমার আহাম্মকীর কথা শুনলে তুইও বোকা হয়ে যাবি হয়ত।···যা বলছিলুম, কাশীতে এসে পর্যন্তই তুলসের কথা শুনছি, কেচ্ছা-কেলেঙ্কার সব, যখন জেলে যায় তাও জানি, জেল থেকে বেরিয়ে এল, এই কারবার করছে—কিছুই শুনতে বাকী ছিল না। ঐ পাড়ায় থাকতুম, ঘুরতুম ফিরতুম, বহু লোকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল—সব কথাই কানে আসত। কিন্তু তা নিয়ে কখনও মাথা ঘামাই নি। চোর ডাকাত ছ্যাচড়া বদমাইস তো সব দেশেই আছে, তীর্থে তো আরও বেশীই থাকবে—কথায় বলে, আলোর নিচেই অন্ধকার বেশি—আমি তার কি

করতে পারি। আমি তো আর দণ্ডমুণ্ডের মালিক নই, ধর্ম্ম বজায় রাখবার ভারও আমাকে কেউ দেয় নি। শুনতুম—দেখতুমও লোকটাকে এই পর্যন্ত। সুন্দর দশাসই চেহারা ছিল। গঙ্গায় চান ক'রে বুকে কপালে চন্দন মেখে গরদের কাপড় পরে যখন উঠে আসত—তখন দেখলে ছেদ্দাই হ'ত, কে বলবে এই লোকটা গুণ্ডা বদমাইস, জেলফেরৎ দাগী আসামী। এক এক সময় আমারও সন্দ হ'ত।

'কিন্তু কিছু দিন পরে আমাকেও মাথা ঘামাতে হ'ল। কুক্ষণে কি সুক্ষণে জানি না—তোর ঠান্‌দি এস্টেজে দেখা দিলেন। রঙ্গমঞ্চে অবতরণ যাকে বলে।'……

বলতে বলতে খানিকটা আপন মনেই হেসে নিলেন। তারপর আবার গল্পের খেই ধরলেন।

হঠাৎ শুনলেন ঠাকুর্দা চৌষট্টি যোগিনীর কাছে একটি নতুন ব্রাহ্মণ পরিবার এসে উঠেছেন, বাংলাদেশের বাস উঠিয়ে চলে এসেছেন তাঁরা —কাশীতেই থাকবেন। নতুন লোক পাড়ায় এলে ঠাকুর্দা যেচেই আলাপ করতেন। এখানেও নিজেই গেলেন। আলাপও হ'ল। শ্রীধর ভট্‌চায নাম, বর্ধমান জেলায় বাড়ি। সামান্য জমিজমা ছিল, কিছু যজমানীও করতেন—এক ছেলে ওঁর হঠাৎ যক্ষ্মায় পড়ল। সামান্য সঙ্গতি তো, আর রোগও তেমন নয়—যে বাড়িতে ঢুকবে ধনে প্রাণে মেরে যাবে। থাইসিসে যে ভাল হবে না সবাই জানে—তবু চিকিৎসাও তো করতে হবে। ওঁকেও করতে হয়েছিল। ভাল ভাল খাওয়ানো, পুরীতে হাওয়া বদলাতে নিয়ে যাওয়া—যা করার সবই করেছেন। ফলে জমিজমা সমস্তই গেছে, ছেলেটিকেও রাখতে পারেন নি। তাতেই দেশ ছেড়ে চলে এসেছেন। কিছু ছিলও না আর পৈতৃক ভদ্রাসন ছাড়া, তার আর মায়া করেন নি, বাসনকোসন বেচে কাশীতে চলে এসেছেন, মা অন্নপূর্ণার আশ্রয়ে। স্বামী-স্ত্রী, আর তেরো-চোদ্দ বছরের মেয়ে একটি। ভদ্রলোকের

বয়স বেশী না, কিন্তু শোকে তাপে শরীর ভেঙ্গে পড়েছিল। তিনটি ছেলে এক বছর দেড় বছরের ক'রে হয়ে মারা যাবার পর ঐ ছেলে, তাকেও রাখতে পারলেন না, এ আঘাত কি কম!

ঠাকুর্দা বললেন, 'একদিন গিয়েই অবস্থা বুঝে নিয়েছিলুম। একেবারে ভাঁড়ে মা ভবানী। আলাপ হওয়ার পর আমিই উয্যুগী হয়ে ভদ্রলোককে কিছু কিছু যজমানী যোগাড় ক'রে দিয়েছিলুম—অধিষ্ঠানে, ব্রত-পার্বণেও যাতে কিছু আদায় হয় সেদিকেও চেষ্টা করতুম। তখন এখানে যাত্রী-তোলা বাড়ি ছিল অনেক, ক'জন বাড়িওলার সঙ্গে ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিলুম—সধবা, কুমারী-পূজো, ভুজ্যি—এগুলি যাতে ওঁরা পান। নগদ যা পাবে বাড়িওলার—মিষ্টি, থালাবাটি, কাপড়চোপড় এঁদের—এই বন্দোবস্ত হয়েছিল, তাতে এঁদেরই লাভ হ'ত, নইলে আধাআধি ব্যবস্থাই দস্তুর।

'এতেই একরকম ক'রে চালাচ্ছিলেন ভদ্রলোক—কিন্তু ভগবানের মার তখনও শেষ হয় নি, বোধহয় গেল জন্মে বসে বসে শুধুই পাপ ক'রে গেছেন ঐ তুলসের মতো, বঞ্চিত ক'রে গেছেন বিশ্বসুদ্ধ মানুষকে,—হঠাৎ একদিন পক্ষাঘাত হ'ল, ঘুম ভেঙ্গে আর উঠতে পারলেন না, বাক্যিও হবে গেল। সে কি অবস্থা রে ভাই—খবর পেয়ে ছুটে গিয়ে দেখি মেয়েটা আছাড়-পিছেড় খেয়ে কাঁদছে, কিন্তু ওঁর স্ত্রীর চোখে জল নেই—বলে না যে, অল্প শোকে কাতর, অধিক শোকে পাথর—তাঁরও বোধ হয় তাই হয়েছিল। পাথরের মতোই গুম খেয়ে বসে আছেন।

'লেগে গেলুম কাজে। পাড়ার দু' তিনটি ছেলেকেও লাগিয়ে দিলুম, তার মধ্যে একটি হিন্দুস্থানী ছেলেও ছিল শান্তাপ্রসাদ বলে, এমন প্রাণ দিয়ে পরোপকার করতে আমি আর কাকেও দেখি নি—তারা কিছু কিছু চাঁদা তুলল, আমি পাতালেশ্বর গলির আশু কবরেজকে ডাকালুম, মেয়েটাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে শান্ত করলুম, বললুম, "কান্নার ঢের সময় পাবে

খুকী—এখন বাপের সেবা করো আগে"। জানি কাজে না লেগে থাকলে মন খারাপ সারবে না। এমনিভাবে র-ব-ঠ ক'রে বছরখানেক চালিয়ে ছিলুম। ছেলেদের বলা ছিল, মাসে দু' আনা হিসেবে বাড়ি বাড়ি চাঁদা তুলবে, কাউকে জুলুম করবে না—কেউ না অসুবিধে ক'রে দেয়। মাসে দুগণ্ডা পয়সা দিতে অত কেউ আপত্তি করত না—অথচ চেনাশুনো মহল ঘুরে মাসে আট-দশ টাকা উঠে যেত তাতে।

'তাতে উপোসটা বাঁচল, আশু কবরেজের হাতে-পায়ে ধরে মনকে আঁখিঠারা গোছের একটা চিকিচ্ছেও হ'তে লাগল—একটা তেল আর বড়ি দিতেন মধ্যে মধ্যে, দাম নিতেন না—কিন্তু তাতে ফল কিছু হল না, হঠাৎ একদিন নাক মুখ দিয়ে রক্ত উঠে ভদ্রলোক কাশী পেলেন। শোকটা এতদিনে এদের গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিল, তাই স্ত্রী-মেয়ে দু'জনেই শান্ত ভাবে মৃত্যুটাকে মেনে নিল।

'কিন্তু আমাদের ওপর আরও দায় চাপল। টাকা তোলা বন্ধ হয় নি—সংসারটাও চলছিল, এবারে আমার যেটা প্রেধান চেষ্টা হলো মেয়েটাকে পার করা। এমন একটা ছেলে দেখে দিতে হবে—যে শাশুড়ীকে সুদ্ধ টানতে পারে, ওঁকে এমন ভিক্ষের ভাতে আর দিন কাটাতে না হয়। পাঁচজনকে বলেও রাখলুম, নিজেও ঘুরতে লাগলুম। তবে আমাদের তো জানিস, যতই সোন্দর মেয়ে হোক, শুধু-হাত কেউ মুখে তুলতে চায় না। ভাল পাত্তর যা দু' একটা পেলুম এত্তখানি খাঁই।'

এর মধ্যে একদিন গিয়ে শুনলেন ঠাকুর্দা—মধ্যে আট-দশ দিন যেতে পারেন নি, এক বুড়িকে নিয়ে প্রয়াগ করাতে গিছলেন এলাহাবাদে—যে, ও মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। পাত্র কে—না ঐ তুলসে!

'বোঝ ব্যাপার! আমি তো অবাক, ওরা না হয় নতুন মানুষ সব শোনে নি, কেউ কি বলেও দেয় নি তুলসে কেমন, কি মতলবে ঐ ফুলের মতো মেয়েটাকে কব্জা করতে চাচ্ছে!···বলতে গেলুম মাকে—শুনতে

শুনতে মুখ সাদা হয়ে গেল মানুষটার কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঘাড় নাড়লেন। বে নাকি বন্ধ করা যাবে না, কোন উপায় নেই। উনিও নাকি শুনেছেন কিছু কিছু কিন্তু যাদের বলতে গেছেন সবাই বলেছে, 'তুলসে? ও বাবা, ও আমরা কিছু করতে পারব না। বে বন্ধ করতে গেলে, আটকাতে গেলে আমাদের জ্যান্ত ছাল ছাড়িয়ে নেবে। আর ও যখন মন করেছে তখন তোমার মেয়ের আর ছাড়ান-ছিড়েন নেই, মেয়েকে খরচের খাতায় ধরে রাখো।'

কথাটা যে কত খানি সত্য তা তিনিও বুঝেছেন—যারা দেখাশুনো করত, সাহায্য করত তারা কেউ ছায়া মাড়ায় না আর—সবাইকে তুলসে ভয় দেখিয়ে দিয়েছে। পাড়ায় যে মুদী চাল-ডাল দিত সে আর মাল দেবে না। নগদ টাকা দিলেও নয়। এদিকে সব পথ বন্ধ ক'রে—পুরো একদিন প্রায় অনাহারে রাখবার পর—তুলসে নিজেই লোক দিয়ে ঝুড়ি ভর্তি সিধে, আনাজ-কোনাজ একরাশ পাঠিয়ে দিয়েছে। তখন আর না নিয়ে উপায় কি? অদ্ভুত শান্ত কণ্ঠে জানালেন ভদ্রমহিলা।

'মাথায়-আগুন-জ্বলে-ওঠা কথাটা শোনাই ছিল এতকাল।' ঠাকুর্দা বললেন, 'ঐদিন বুঝতে পারলুম। কথাগুলো শুনতে শুনতে মনে হ'ল শুধু আমার মাথায় নয় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেই বুঝি আগুন জ্বলছে। চারিদিক লাল দেখতে লাগলুম, কিন্তু ওঁকে কিছু বললুম না, শ্রীধর ভট্‌চাযের পরিবারকে। মেয়েটা দেখলুম ঘরের এক কোণে মেঝেতে পড়ে আছে, উঠলও না—আমার দিকে তাকালও না। বুঝলুম কেঁদেই চলেছে। সারাজীবন যা করতে হবে, তারই রিয়েসাল দিয়ে নিচ্ছে।

'কিছু বললুম না, তার কারণ মেয়েমানুষ জাতকে বিশ্বাস নেই। চানক্য বলেছেন কাজ যা করবে তা মনে মনে ভেবে নিও, কখনও প্রেকাশ করতে যেও না। এতকাল জগৎটাকে দেখে ঠেকে শিখেছি—কথাটা বর্ণে বর্ণে সত্যি।···ওখান থেকে বেরিয়ে লক্ষ্য করলুম তুলসের

এক চেলা পানের দোকানে দাঁড়িয়ে হাই তুলছে—মানে এ বাড়ির ওপর নজর রাখছে! বুঝলুম এ মেয়ে বেচে অনেক দাম পাবার আশা রাখে, তাই এত আয়োজন। নেহাৎ আমাকে ভয় দেখাতে সাহস করল না তার কারণ—মোটামুটি কাশীর ব্রাহ্মণ সমাজে চেনা হয়ে গেছে, কৈলেসদা ভালবাসেন—আমাকে ঘাঁটাতে গেলে যদি সোরগোল বাধে? তাছাড়া আমাকে আধপাগলা ভিখিরী বলেই ভাবত, আমি যে ওর কোন অনিষ্ট করতে পারব তা মনে করে নি।'

ওখান থেকে বেরিয়ে ওঁরা যে ক'জন বামুনের ছেলে একটা সমিতি মতো করেছিলেন—সবাই ভাল ভাল ঘরের ছেলে, ওদিকে কেদারঘাট মানসরোবর আউদগর্বি থেকে শুরু ক'রে এদিকে গণেশমহল্লা পর্যন্ত—অনেকেই ছিল, শ্রীধর ভট্‌চাযকে সাহায্য করার জন্যেই এককালে এদের শরণাপন্ন হয়েছিলেন ঠাকুর্দা—এখন এরা বেশ একটা সমিতি করে নিয়েছে 'অন্নপূর্ণা বান্ধব ভাণ্ডার' নাম দিয়ে—তাদের মধ্যে বেছে বেছে ক'জনের সঙ্গে গোপনে দেখা ক'রে বলতে গেলেন উনি, সবাই যেন ভূত দেখল একেবারে।. প্রথমটা কেউ কানই দিতে চায় না, তুলসের ভয়ে সিটিয়ে আছে সকলে। উনি তবু হাল ছাড়লেন না। অনেক ক'রে বোঝালেন। কত লোক আছে তুলসের তাঁবে? ওর তো পয়সা দিয়ে লোক পোষা—কত লোক পুষতে পারে? এঁরা যদি এতগুলো লোক এক হন—ওঁদের সামনে দাঁড়াতে পারবে? ভয়টাকে বড় ক'রে দেখলেই বড় হয়ে যায়, ওঁরাও মানুষ তো। না কি গরু ছাগল? কী করবে, খুন করবে? এত সাহস নেই। একবার জেল খেটে এসেছে—দাগী আসামী।

বলতে বলতে, ধিক্কার দিতে দিতে ওঁদের মন শক্ত হ'ল অনেকটা। তারপর সবাই মিলে মতলব আঁটতে বসলেন। সময় ছিল, সেটা তখন চৈত্র মাস যাচ্ছে। বৈশাখের আগে বিয়ে হতে পারবে না। মানে

তুলসের আর চৈত্র মাসই বা কি বৈশাখ মাসই বা কি—কিন্তু এদের কোন্ লজ্জায় বলবে চৈত্র মাসে মেয়ের বিয়ে দাও! চৈত্র মাস বলে তাঁদেরও একটু সুবিধে হয়ে গেল, বুঢ়ুয়া মঙ্গলের মেলা সামনে—সকলেরই মন পড়ে থাকবে গঙ্গার দিকে। গুণ্ডা বদমাইশ লোকদের মহা-উৎসব—এ সময় সবাই ব্যস্ত থাকে। ভীড়ে দেখাশুনো করা কি কোন লোককে ধরার ভারি সুবিধে।

'ধরলুমও। তুলসের যারা পুরুত নাপিত বরযাত্রী সাজত—অনেক খুঁজে তাদের নামগুলো পেলুম। তারপর পাঁচ-সাতজনে মিলে তাদের একে একে ধরলুম। কাউকে ভয় দেখিয়ে, কাউকে লোভ দেখিয়ে কায়দা করা হ'ল। ভয় দেখিয়েই বেশির ভাগ। এক বেটা শুঁড়ি ছিল, সে-ই নাপিত সাজত, খুব পয়সা পেত তুলসের কাছ থেকে—তাকে আর কোনমতে কায়দা করতে পারি না। হঠাৎ কি খেয়াল গেল, পিরানের মধ্যে থেকে পৈতে বার ক'রে ছিঁড়ে শাপ দিতে গেলুম। যে এতকাল এত কথায় ভয় পায় নি—সে ঐতেই ভয় পেয়ে গেল। কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ে আমার পায়ে হাত দিয়ে দিব্যি গাললে সব কথা খুলে বলবে। বললেও সব, গলগল ক'রে বেরিয়ে এল সব কথা। কাকে কোথা থেকে এনেছে, কোন্ গ্রাম, মেয়ের বাপ কী করে—কোন্ মেয়েকে কলেরা ধরিয়েছে, কাকে থাইসিস, কার বেলা অমুকের সঙ্গে বেরিয়ে গেছে—এই দুর্নাম দিয়েছে, সব খবরই পাওয়া গেল।

'বাকী ক'জনকে গিয়ে এই খবর একেবারে নামধাম-বিবরণ সমেত সব বলা হ'ল। কে বলেছে তা বললুম না। শুধু বললুম যে আমরা সব জেনেছি। সাক্ষী-সাবুদ সব মজুত। এবার আর কোনমতেই বাঁচোয়া নেই তোমাদের সর্দারের। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর অনিবার্য। তোমাদেরও আট-দশ বৎসর জেল হবে—পাথর ভেঙ্গে ঘানি টেনে প্রাণটা বেরিয়ে যাবে। যদি অল্পে পার পেতে চাও—রাজার সাক্ষী হও, নিজে থেকে

সব স্বীকার করো। তাদের আগেও কিছু কিছু ভয় দেখানো হয়েছে।' একজনকে—যে বেটা পুরুত-সাজে তাকে অনেক টাকা কব্‌লে লোভ দেখানো হয়েছিল। তবু ইতস্তত করছিল একটু আধটু—আমাদের মামলা সাজানো হয়ে গেছে দেখে এবার ঘাবড়ে গেল। আমি আর তাদের সময় দিলুম না—এক চেনা উকীলের বাড়ি নিয়ে গিয়ে এজাহার লিখিয়ে—সই করিয়ে—চার-পাঁচজন সাক্ষীকে দিয়ে দস্তখৎ ও সনাক্ত করিয়ে নিলুম।'

এর পর কি করবেন তাও ঠিক ছিল। তখন এক নতুন সাহেব ম্যাজিস্ট্রেট এসেছে কাশীতে। খুব বুড়োও না, একেবারে ছোকরাও না। পুলিশের কাছে গিয়ে কোন লাভ হবে না তা জানতেন এঁরা। যে এতখানি সাহস করে—তার ওসব পীরের দরগায় আগেই সিন্নি চড়ানো থাকে। মিছিমিছি ঘাঁটাতে গেলে—ওরাই হয়ত সাবধান ক'রে দেবে—সটান তাই চলে গেলেন এঁরা সাহেবের কাছে। এঁদের দলে ছিল কাশী-নরেশের দেওয়ানের ছেলে বিশ্বনাথ, সে বেশ বলিয়ে কইয়ে ছিল, সাহেবদের মতো ইংরিজী বলতে পারত। সে-ই এদের হয়ে কথা বলল হাকিমের সঙ্গে। সব কাগজ-পত্র দিয়ে, লোকটা আগেও কী ঘৃণ্য ব্যাপারে লিপ্ত ছিল—সেজন্যে চার বছর জেল খেটেছে জানিয়ে—শেষ পর্যন্ত বলে দিলে, পুলিশে ওর কাছ থেকে ঘুষ খায় তা সকলেই জানে, আর তা হাকিম বাহাদুরও বুঝতে পারছেন নিশ্চয়, নইলে এমন সব কাজ করার পরও এতকাল ধরে বুক ফুলিয়ে শহরের মধ্যে বাস করছে কি ক'রে! এখন হাকিম বাহাদুর যদি এর প্রতিকার না করেন তো বোঝা যাবে তিনিও এর মধ্যে আছেন, পুলিশ মারফৎ তাঁর কাছেও ঘুষ এসে পৌঁছয় কিছু—সেক্ষেত্রে এঁদের খবরের কাগজের সাহায্য নেওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না। বসুমতীর সম্পাদক কাশীতে এসেছেন, তাঁর কাছেও এর একসেট কাগজপত্র দিয়ে দেওয়া হয়েছে—হাকিম বাহাদুর যদি এই

অনাচারের কোন প্রতিকার না করেন তো তিনি বলেছেন এসব খবর বিস্তৃত ক'রে তাঁর কাগজে ছাপবেন। পুলিশ আর জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিষ্ক্রিয়তার খবর সুদ্ধ।

'সব শুনে আর ওদের এজাহার দেখে সায়েবের লালমুখ আরও লাল হয়ে উঠল। তিনি বললেন, "অত কিছু করতে হবে না। তোমরা নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ি যাও।···তোমাদের ঐ ড্যাম্‌ড্‌ নেটিভ্‌ পেপার বসুমতীকে বলো তাকে ভাল খবরই ছাপতে হবে। আমাকে গালাগাল দেবার সুযোগ পা বে না।" সাহেব হয়ত ভাল, হয়ত ভাল না—ঘুষখোর—কিন্তু যাই হোক বসুমতীর নাম করায় কাজই হয়েছে, তখন বসুমতীর খুব নাম, সবাই ভয় করে।'

'তা সাহেব দেখালও বটে' বললেন ঠাকুরদা। অসম্ভবই নাকি সম্ভব করেছিলেন। কী ক'রে কি কলকাঠি নেড়েছিলেন তা তিনিই জানেন, মোদ্দা ওঁরা যাওয়ার পর থেকে বারো ঘণ্টার মধ্যে তুলসেকে হাতে হাতকড়া কোমরে দড়ি পরিয়ে ধরে নিয়ে গেল পুলিশ, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ওর সাঙ্গোপাঙ্গোদের সবাই গিয়ে হাজতে ঢুকল। যারা সাক্ষী দিয়েছিল—তাদের একেবারে আলাদা জায়গায় রাখা হ'ল, যাতে তুলসের লোকরা না ভয় দেখাতে পারে। সেইখানেই থামল না পুলিশ,—বোধ হয় সাহেবের ধমকেই—সেই বালিয়া ছাপরা গোরখপুর বেতিয়া—সব জায়গায় খবর চলে গেল—তাদের মেয়েগুলোর কী পরিণাম হয়েছে! সাত-আট দিনের মধ্যে সেসব মেয়ের বাপ বা অভিভাবক কাশীতে এসে পৌঁছল। এবারও খুব জোর মকদ্দমা হ'ল—তবে এবার দেখা গেল, তুলসেকে বাঁচাতে একটি প্রাণীও এগিয়ে এল না। তুলসে যাদের কাছে খবর পাঠাল তারা সব পরিষ্কার বলে দিল, তুলসেকে তারা চেনে না, কস্মিনকালে তাদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল না। ফলে মকদ্দমাও বেশী দিন টানবার দরকার হ'ল না, মাস ছয়েকের মধ্যেই শেষ হয়ে গেল। তুলসের মেয়াদ হ'ল সাত

বছর। সাঙ্গোপাঙ্গদের কারুর চার বছর কারুর পাঁচ। যারা সাক্ষী দিয়েছিল তাদের নামমাত্র সাজায় ছেড়ে দেওয়া হ'ল।

॥ ১২ ॥

নাটকীয় ভাবে এই পর্যন্ত বলে ঠাকুর্দা আর এক ছিলিম তামাক ধরিয়ে নিলেন। তার পর আমার অনুরোধের অপেক্ষা না রেখে নিজেই শুরু করলেন আবার।

'তুলসের সেই শেষ। এবার জেল থেকে বেরিয়ে আর কাশী আসে নি। শেষ যে বে করেছিল, গাজীপুরের দিকের এক গাঁয়ের মেয়ে, ভদ্রলোক হোমিওপ্যাথি ডাক্তারী ক'রে খায়—অনেকগুলো ছেলেমেয়ে—তবু তার একটা পার হচ্ছে ভেবে কোন খবরই করে নি—সে বৌটোকে আর পাচার করবার সময় পায় নি, চারে জীইয়ে রেখেছিল। তার পরই তো এই বিত্তান্ত—মোকদ্দমার সময় বাপ এসে নিয়ে গিয়েছিল, সেই খানেই পড়ে ছিল—সেই সুবাদে তুলসেও গিয়ে সেখানে উঠল। তা সে শ্বশুর ভাল, বলেছিল, "যা হবার হয়েছে, এখন এইখানে জমিজমা দেখে দিচ্ছি, চাষবাস করো, খাও।" রাজীও হয়েছিল—কিন্তু স্বভাব যায় না মলে। গুণ্ডার স্বভাব কোথায় যাবে, চণ্ডালের রাগ—ঐ যারা ওর বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়েছিল তাদের ওপর শোধ নেবার ইচ্ছেটা ত্যাগ করতে পারল না।

'একটু সামলে নিয়েই চুপ্‌চুপ্‌ কাশীতে এল। সেই নাপ্‌তে বেটাকে আগে শেষ করবে এমনি মতলব ছিল, কিন্তু সে-ও মহা ধুরন্ধর। তুল্‌সে জেল থেকে বেরিয়েছে খবর পেয়ে পজ্জন্তই তক্কে তক্কে ছিল—লোকও লাগিয়ে রেখেছিল পিছনে—রাত্তিরের গাড়িতে যেমন সিকরোল এসে নেমেছে, ওর দুজন লোক ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলে লাইনে। তখনই একটা মালগাড়ি আসছিল—থেঁৎলাতে থেঁৎলাতে সাত হাত দূরে টেনে

নিয়ে গেল—মানুষটাকে চেনবারই জো রইল না। নিহাৎ পকেটে কি সব কাগজপত্তর ছিল আর ডান উরুতে একটা সাদা জড়ুল—তাইতেই লাশ সনাক্ত হ'ল।...

'বাইবেলে নাকি একটা কথা আছে শুনেছি—পাটনার সেই নিতাই-বাবু বলতেন—যে তলোয়ারের জোরে বড় হয় তলোয়ারেই তার সব্বনাশ ঘটে। তা তুলসেরও হ'ল তাই!'

অনেকক্ষণ এক নাগাড়ে বকে ঠাকুর্দা বেশ একটু থকেই গিয়েছিলেন—এবার খানিকটা চোখ বুজে বসে রইলেন। তারপর উঠে আর এক ঘটি জল খেয়ে এলেন আবার।

মায়া হবারই কথা ওঁর অবস্থা দেখে, কিন্তু আমার আর তখন মায়া দেখাতে গেলে চলে না। এখানে থাকার মেয়াদ বেশী দিনের নয়। থাকলেই খরচা, সুতরাং সীমাহীন ইচ্ছা সত্ত্বেও দু' একদিনের মধ্যে পাততাড়ি গুটোতে হবে। কাল যে আবার আসতে পারব ঠিক এই সময়ে—তা বলা কঠিন। যেটুকু জানবার এখনই জেনে নিতে হবে, সতীদি আসবার আগেই।

তাই একটু কেশে, বার দুই মাথা চুলকে বললুম, 'এ তো হ'ল—সতীদিকে উদ্ধার দানবের কবল থেকে, কিন্তু তিনি আপনার কুক্ষিগত হলেন কি ক'রে সেটা তো বললেন না এখনও— ?'

'গেরো! কপালে গেরো থাকলে কে খণ্ডাতে পারে বল্! ওর কপালে আছে দুঃখের পেছনে দড়ি দেওয়া তার আমি কি করব। ঝিকে ঝি—রাঁধুনীকে রাঁধুনী, স্যাবাদাসীকে স্যাবাদাসী—আবার ইদিকে রোজগেরে বাবু। আমার পাল্লায় পড়ে সব করতে হবে—এ যে বিধেতা-পুরুষের লেখন ওঁর অদেষ্টে!'

ঠাকুর্দা দারুন উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, যেন জ্বলে উঠলেন একেবারে। বললেন, 'তুলসে তো গেল—বেশ শান্তি হ'ল—আর কোন ভাবনা নেই,

আমি উঠে পড়ে লাগলুম ওর জন্যে একটা পাত্তর খুঁজতে। বুঝলুম যে আর নয়, এ আগুন উনুনের মধ্যে পুরতে না পারলে নিস্তার নেই। নিজেও জ্বলবে, পরকেও জ্বালাবে। তুল্‌সেকে তো একটাই পাঠান নি ভগবান সংসারে।

'পাঁচজনকে বলে রাখলুম। বামুন পাড়ায় জনে জনে গিয়ে জানালুম। আমাদের ভাণ্ডারের ছোঁড়াগুলোকেও বললুম; সোন্দর মেয়ে—খুব ভরসা ছিল বুকে—ভাল পাত্তর একটা পাওয়া যাবেই। তা সে দফা উনিই গয়া ক'রে দিলেন। নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারলেন, বেশ ভেবেচিন্তে, হিসেব ক'রে।...একদিন ওদের খবর নিতে গেছি, ওর মা কেমন যেন অপ্রস্তুত অপ্রস্তুত ভাবে, খুব সঙ্কোচের সঙ্গে ডেকে এককোণে নিয়ে গিয়ে কথাটা পাড়লেন, "বাবা, তুমি তো পাগলীর পাত্তর খুঁজতে সারা পৃথিবী তোলপাড় করছ—ও তো এক কাণ্ড ক'রে বসে আছে! এখন কী করবে করো। এসব বলাও যায় না, অথচ না বললেও নয়। আমার তো কিছু মাথাতে আসছে না"।

'আমি তো অবাক। ওঁর কথার ভাবে মনে হ'ল খুব একটা গর্হিত কাজ ক'রে ফেলেছে মেয়েটা—জাত-কুল নষ্ট হবার মতো।...কিন্তু তেমন মেয়ে তো মনে হয় না। আর ঐটুকু মেয়ে!—আমার তখন এমন মনের অবস্থা জিগ্যেসও করতে পারছি না—কী কাণ্ড ক'রে বসে আছে!

'বললেন ওর মা নিজেই। আরও একটু লজ্জা-লজ্জাভাবে অপ্রস্তুতের হাসি হেসে বললেন, "ও নাকি বাবা কেদারনাথকে ছুঁয়ে দিব্যি গেলেছে যে তোমাকে ছাড়া নাকি কাউকে বিয়ে করবে না"!

'আমি তো অবাক। কথাটা মাথায় ঢুকতেই আমার বিলক্ষণ দেরি হ'ল। তারপর মনে হ'ল আমি ভুল শুনছি, না হয় ওঁর মাথাটাই খারাপ হয়ে গেছে। আরও অনেক পরে বুঝলুম যে ভুল শুনি নি।

'মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল, একেবারে, "সেকি!...কী বলছেন

কি! মাথা খারাপ নাকি? না না, ওসব পাগলামি করতে বারণ করুন ওকে! ছি ছি! কি বলছেন। তাছাড়া আমাকে বে—আমি তো ও কাজেই যাব না। সেই জন্যেই তো আরও এমন বাউণ্ডুলে হয়ে আছি। হ্যা— —। না চাল না চুলো, একপয়সা রোজগার করি না, এই চেহারা, অন্ধকারে দেখলে লোক আঁৎকে ওঠে, খুব পাত্তর খুঁজে বার করেছে বটে"!

'হেসে উড়িয়ে দিতে যাই কথাটা। এদিকেও ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়েছে একরকম। যা ভয় দেখিয়ে দিয়েছিলেন, ওর মা। ভেবেছিলুম না জানি কি একটা খুব খারাপ কাজ ক'রে বসে আছে!

'কিন্তু ভদ্রমহিলা হাসিঠাট্টার ধার দিয়ে যান না। বলেন, "মেয়ে যে বাবা কোন কথাই শুনছে না—তার কি করি। বলে, উনি আমাকে সব্বনাশের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন, মহাদুগ্‌গতি থেকে রক্ষে করেছেন—ওরকম অবস্থা হ'লে তো মৃত্যু ছাড়া পথ থাকত না, কাজেই এ জীবনও ওঁর দেওয়া। আমি সেই দিন থেকেই মনে মনে ওঁকে স্বামী বলে ভেবে রেখেছি—হিঁদুর মেয়ের আবার বিয়ের কি বাকী আছে? তাছাড়া বাবাকে ছুঁয়ে দিব্যি গেলেছি—আমার আর কোন পথ নেই—এখন উনি না নেন, ওঁর ধম্ম ওঁর কাছে, আমাকে তাহলে গঙ্গায় ডুবে মরতে হবে, এর পর কনে সেজে আর কাউকে মালা দিতে পারব না।"…ও মেয়ে বাবা সাংঘাতিক, কত বললুম কত বোঝালুম—আমি কি কম বুঝিয়েছি, কিন্তু সে সব ভস্মে ঘি ঢালা। বজ্জাত ঘোড়ার মতো ঘাড় বাঁকিয়ে বসে আছে, কোন কথাই শুনছে না। বলে না—মোষের শিং বাঁকা যোঝবার বেলা একা, তা ও মেয়েরও হয়েছে তাই"!

'বোঝ ব্যাপার! উনি তো খুব আহ্লাদ ক'রে বললেন। এক কথায় কথার তেইশ মেরে দিলেন। এখন আমি কি করি!…আমিও অনেক ক'রে বোঝালুম, পায়ে-হাতে ধরতে গেলুম বলতে গেলে, পাঁচজনকে দিয়ে

বোঝাবার চেষ্টা করলুম, অনেক গুরুজন প্রবীণ লোককে ডেকে আনলু:
—মেয়ের সেই এক কথা, তুমি বে না করো—গঙ্গায় গিয়ে উলব। বলি কিছু নেই, পথের ভিখিরী—তা জবাব দেয় "শ্মশানে বাস করে জেনেই তো মা দুগ্‌গা শিবকে বে করেছিলেন।"—এঁচোড়ে পাকা মেয়ে, পাড়াগাঁয়ের মেয়েরা ভারী পাকা হয় নাতি—এ তুমি দেখে মিলিয়ে নিও —শহরের মেয়েদের এক হাটে বেচে আর এক হাটে কিনে আনতে পারে। যারা মুখ্‌খু তারাই বলে সরলা পল্লীবালা! মরুক গে—আমার যা করবার তা চূড়োন্ত করেছি—কোন চেষ্টা বাকী রাখি নি, তাতেও যখন শুনল না আমার রাগ হয়ে গেল, সোজা বলুলুম, "মরগে যা! অদেষ্টে দুঃখ না থাকলে এমন বদ বুদ্ধি হবে কেন। কর্ আমাকে বে, কত সুখ, প্রাণে কত রস আছে টের পা একবার!"…মিটে গেল —বিত্তান্ত। সে-ই উনি আমার ঘাড়ে চাপলেন—কিম্বা আমিই ওঁর ঘাড়ে চাপলুম।'

কেন যে এ বদবুদ্ধি—তাও অবশ্য ঠাকুর্দাই বললেন—আর একটু পীড়াপীড়িতে।

সতীদি নাকি ঐ ঘটনার আগে থাকতেই ওঁর প্রেমে পড়েছিলেন। বাবার অসুখের সময় এবং মৃত্যুর পর রমেশ ঠাকুর্দা যা করেছেন—যে অমানুষিক পরিশ্রম ও স্বার্থত্যাগ—ওদের বাঁচিয়ে রাখতে, তা নাকি এই কলিযুগে কেউ কারও জন্যে করে না। আরও পাঁচজনে করেছে ঠিকই, তবে তারাও করেছে ওঁর জন্যে, ওঁর চেষ্টা আর দৃষ্টান্তেই।

সে-ই যেন নতুন দৃষ্টি খুলল সতীদির।

নতুন এক চোখে দেখলেন তিনি রমেশ ঠাকুর্দাকে। তাঁর মনে হ'ল সাক্ষাৎ শিব, স্বয়ং বিশ্বনাথ এমনি ভাঙ্গড় ভোলা ভিখারী সেজে এসেছেন ওদের ত্রাণ করতে।

সেই যে কিশোরী মেয়ের চোখে মায়া ও মোহের অঞ্জন লাগল, ঐ

কুৎসিত প্রায়-প্রৌঢ় ঠাকুর্দা সেই যে পরম কাম্য রমণীমোহন রূপে তার চোখে প্রতিভাত হলেন—সে মায়া, সে ভ্রান্তি আর জীবনে ঘুচল না। ঠাকুর্দার উদার কোমল অন্তরের অসীম ঐশ্বর্যই তিনি দেখেছিলেন সেদিন—তাই বাইরের এই খোলসটা চোখে পড়ে নি। কোনদিনই পড়ে নি, জীবনভোর সেই মুগ্ধ দৃষ্টিটিই রয়ে গেছে তাঁর—সেদিনের সে ছবি কোন-দিনই মোছে নি।

তার পর যখন সাক্ষাৎ কালান্তক যমের মতো—মূর্তিমান পাপের মতো তুলসে এল তার জীবনে—দেখলেন যাদের শক্তি-সামর্থ্য আছে—সমস্ত পাড়া, সমস্ত পরিচিত লোক—এমন কি দোকানদাররা পর্যন্ত ওর ভয়ে আড়ষ্ট, জন্তু হয়ে গেছে—কেবল এই শীর্ণ কৃশতনু নিঃস্ব লোকটি ছাড়া।

এই আপাতদুর্বল মানুষটিই শুধু যথার্থ পুরুষের মতো, পুরুষ-সিংহের মতোই রুখে দাঁড়িয়েছিলেন, এবং রক্ষাও করেছিলেন তাঁকে সেদিন—অসম্ভব সম্ভব করেছিলেন।

আবারও নূতন রূপেরই ঘোর লেগেছিল সেদিন সতীদির চোখে।

মদনমোহন সেদিন লজ্জানিবারক শ্রীকৃষ্ণ রূপ, ভাঙ্গড় ভোলা বৃদ্ধ ভিখারী শিব সেদিন ত্রিপুরারি রূপ ধারণ করেছিলেন। তাই বয়স, রূপ, ভরণ-পোষণের সামর্থ্য—কোন কথাই আর ভাববার অবসর পান নি সতীদি!

'তবে একটা কথা বলব নাতি, সে শুনতে আসছে না, তার ধম্ম শুনছে—সেই যে জেদ ক'রে এসেছিল, গলায় মালা দিয়ে—তারপর থেকে টানা এই দুঃখুটা ভোগ ক'রে যাচ্ছে, একটা দিন, একটা মিনিটও তার জন্যে মুখে টুঁ শব্দটি উচ্চারণ করে নি, কি আমাকে গঞ্জনা দেয় নি। এতটা বোধ হয় মা দুগ্‌গাও পারতেন না! অসুখ হয়েছে, একশ পাঁচ জ্বর—তার মধ্যে উঠেও আমায় ভাত রেঁধে দিয়েছে, আমার আর কারও রান্না মুখে রোচে

না বলে।···ওরই কপাল, গেরোর ফের—নইলে ওর যা রূপ-গুণ, রাজার ঘরে পড়বার কথা!'

এই বলে একেবারে চুপ ক'রে গেলেন। বাইরে তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে, সামনে বাগানের ওপারে হিন্দুস্থানীদের বাড়ির কার্নিশে কবুতররা ফিরে এসেছে, করবীগাছের ডালে কতকগুলো ছোট পাখী আশ্রয় নিয়ে কিচির মিচির করছে—সেই দিকে চেয়ে তাদের দিকে কান পেতে বসে রইলেন যেন। অন্ধকারে ভাল দেখতে পেলুম না, তবু আমি হলপ ক'রে বলতে পারি—চোখ দুটো ওঁর ছলছল করছিল, প্রেমে, স্নেহে, সহানুভূতিতে—পত্নীগর্বে।

হয়ত জলও ঝরে পড়ছিল তোবড়ানো শীর্ণ দুই গাল বেয়ে।

আমিও আর কোন কথা তুললুম না। এখন কথা কওয়াতে যাওয়া মানে ওঁর ওপর অত্যাচার করা। 'আচ্ছা আসি এখন ঠাকুর্দা' বলে পায়ের ধূলো নিয়ে উঠেই পড়লুম একেবারে।

সতীদির আসবার সময় হয়ে এল—তাঁর সামনে আর এ অবস্থায় পড়তে চাই না। তাঁর চোখে কিছুই এড়াবে না, আমাকে বকাবকি করবেন বুড়ো মানুষকে উত্ত্যক্ত করার জন্যে।

॥ গ্রন্থশেষ ॥

পুরাণের সতীর থেকেও ঢের বড় সতী আমাদের সতীদি কিন্তু এ জন্মে বিধাতার কাছ থেকে তাঁর এই তপস্যার কোন পুরস্কারই পান নি।

একমাত্র এই স্বামী-লাভ ছাড়া তাঁর কোন সাধই পূরণ করেন নি বিশ্বনাথ।

সবচেয়ে যেটা বড় প্রার্থনা ছিল—'তোরা বল, বাবাকে জানা, বুড়ো যাতে আমার কোলে যায়—তোদের পাঁচজনের বাড়ি মেগে আমার দিন

একরকম ক'রে কেটেই যাবে—আমি গেলে বুড়োর বড় কষ্ট হবে, না খেয়ে উপোস ক'রে কোথায় মুখ থুবড়ে পড়ে মরবে!'—সেটাও শোনেন নি ভগবান।

এর অনেকদিন পরে, উনিশশো সাঁইত্রিশ কি আটত্রিশ সালে—আজ আর ঠিক মনে নেই—আর একবার দেখা হয়েছিল ঠাকুর্দার সঙ্গে।

ঠানদি যে নেই সে খবর আগেই পেয়েছিলুম, ওপাড়ার সতীশবাবুর মুখে, হঠাৎ একদিন শিয়ালদার বাজারে দেখা হয়ে গিয়েছিল—কিন্তু ঠাকুর্দার কি হল সে খবর পাই নি। শুনলুম ঠানদি নাকি একদিন চাকরি সেরে রাত্রে ফিরে এসেছিলেন-জ্বর নিয়ে। সামান্য জ্বর, পরের দিন বাইরে রাঁধতে যেতে পারেন নি, তবু উঠে বুড়োর রান্না ঠিক ক'রে দিয়েছিলেন, নিজের জন্যে একবাটি সাবুও। কিন্তু বিকেলে আর উঠতে পারলেন না। সাড়াও দিলেন না কথাও কইলেন না।

ঠাকুর্দা অনেক দিনের লোক, অনেক মৃত্যু দেখেছেন, হেঁট হয়ে নিঃশ্বাস নেবার ধরন দেখে আর গায়ে হাত দিয়েই ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন। চিৎকার ক'রে কাঁদতে কাঁদতে গিয়ে লক্ষ্মীবাবুকে জানালেন ব্যাপারটা। ওঁর চিৎকারে আরও পাঁচজন ছুটে এল। ডাক্তারও ডাকা হল—একজন নয়, খবর পেয়ে দুজন ডাক্তার এসে গেলেন, সতীদিকে সবাই ভক্তি করত, কিন্তু কিছুই করা গেল না। শেষরাত্রে ঊষার স্পর্শ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

সাবিত্রী চতুর্দশীর দিন সেটা, খবর পেয়ে নাকি পাড়াসুদ্ধ ভেঙ্গে পড়েছিল মেয়ের দল, সিঁদুর দিতে আর প্রসাদী সিঁদুর নিয়ে যেতে।

এ সবই বলেছিলেন সতীশবাবু। কিন্তু বুড়োর কি হ'ল তা বলতে পারেন নি।

কাশীতে পৌঁছে আগে ঐ বাড়িতেই গেলুম। দেখলুম সে ঘরে একটি মোটাসোটা বিধবা মহিলা বাস করছেন—যে ঘরে ঠাকুর্দা থাকতেন।

তিনি কিছু বলতে পারলেন না। ওপরে প্রয়াগবাবুরাও নেই, প্রয়াগবাবু মারা গেছেন, তাঁরা এখন সব ওঁর বড় ছেলের কর্মস্থল কানপুরে চলে গেছেন। লক্ষ্মীবাবুর সঙ্গে আমার খুব একটা পরিচয় ছিল না—তবু অগত্যা তাঁর কাছেই গেলুম।

লক্ষ্মীবাবু অবশ্য নাম বলতেই চিনতে পারলেন। ঠিকানাও দিলেন। তাঁর মুখেই শুনলুম, এতকাল পরে ঠাকুর্দার কে এক সম্পর্কে ভাইঝি-জামাই কাশীবাস করতে এসেছে—তারা খুব ঘেঁষ দেয় নি—এ পাড়ার সকলে গিয়ে বলতে নিহাৎ চক্ষু লজ্জায় পড়েই নিয়ে গেছে বুড়োকে। পীতাম্বরপুরায় থাকেন ভদ্রলোক, হীরেন চক্রবর্তী নাম, কোন সরকারী হাসপাতালের ডেন্টিস্ট ছিলেন, রিটায়ার ক'রে এখানে এসেছেন, দশাশ্বমেধের কাছে কোথায় বুঝি একটা চেম্বারও করেছেন—পেন্‌সনের টাকায় আর যা টুকটাক এখানে আয় হয় তাইতেই চলে।

খুঁজে খুঁজে পীতাম্বরপুরার সে বাড়িতে গেলাম পরের দিন।

আগেই ঠাকুর্দার সঙ্গে দেখা হ'ল। বাড়িটার পথের ওপরে যে ঘর তাতে একটা নিরাবরণ তক্তাপোশ পাতা—অর্থাৎ বাইরের ঘর সেটা, তার পিছনে অন্ধকূপের মতো ঘর—দিনের বেলায় কিছুই ঠাওর হয় না ঘরে কি আছে বা কে আছে—সেইটেই নির্দিষ্ট হয়েছে রমেশ ঠাকুর্দার জন্যে। সেই ঘরের রকে থুম হয়ে বসে আছেন বৃদ্ধ। চিনতে পারলুম আদল দেখে—নইলে চেনার উপায় নেই বিশেষ, আরও রোগা আরও বুড়ো হয়ে গেছেন।

আমায় দেখে, বা বলা উচিত আমার গলা শুনে, সেই প্রায়-দৃষ্টিহীন চোখও যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠল, 'কে নাতি, আয় আয়। বোস।' বললেন, কিন্তু বসব কোথায়? সেই ভেবেই তাড়াতাড়ি মেঝেতে হাতের ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে বাইরের ঘরে এনে বসালেন। তারপর—

কোন কিছু কথা কইবার কি কোন প্রশ্ন করার আগেই ঝরঝর ক'রে কেঁদে ফেললেন।

কী সান্ত্বনা দেব বৃদ্ধকে—কিছুই ভেবে পেলুম না। তাই হাত ধরে পাশে বসিয়ে নীরবে হাতটাই ধরে রইলুম শুধু।

অবশ্য নিজেই শান্ত হলেন, প্রায় তখনই।

সব জানতেও পারলুম অবস্থা। এঁরা বাড়িতে ঠাঁই দিয়েছেন বটে—লোক গঞ্জনা এড়াতে না পেরে—হাঁড়িতে দিতে পারেন নি। ভাইঝি নাকি স্পষ্টই বলে—'বাপ-মা ভাইদের ফেলে স্বার্থপরের মতো চলে এসেছিলেন, ওঁর সঙ্গে আমাদের কিসের সম্পর্ক? তখন মনে ছিল না যে আত্মীয়দের কখনও দরকারে লাগতে পারে!'

সুতরাং ছত্তরে খেতে যেতে হয় প্রত্যহ।

তবু এই কাছেই নাটকোটার ছত্রে ব্যবস্থা হয়েছে তাই। খুবই কষ্ট হয়, যাবার সময় যতটা না হোক, আসবার সময় যেন দম বেরিয়ে যায়। যেদিন শরীর খারাপ হয় যেতে পারেন না, সেদিন খাওয়াই হয় না।

রাত্রে দয়া ক'রে এরা দুখানা রুটি দেয়, আর ডালের ওপর...র জলটা, তাতেই ভিজিয়ে চট্‌কে খান। ঐ ঘরে পড়ে থাকেন, বিছানার চাদর কি বালিশের ওয়াড কি পরনের ধুতি—ঝিটা দয়া ক'রে এক একদিন কেচে দেয় তাই। নইলে তেল-চিটচিটে বিছানাতেই পড়ে থাকতে হয়। ···ঘরে আলো নেই, সেটা বলেই অবশ্য তাড়াতাড়ি বলেন, 'আমারই বা আলোতে কি হবে বল, চোখে দেখতে পাই না—পড়াশুনো করার তো জো নেই—আমার কাছে আলো থাকাও যা না থাকাও তাই।'

কাউকে দোষ দিলেন না ভদ্রলোক, কোন অনুযোগ কি বিলাপ করলেন না, যেটুকু জানতে পারলুম নিজে খুঁচিয়ে প্রশ্ন ক'রে। কারও

সম্বন্ধেই কোন নালিশ নেই, বিধাতার সম্বন্ধেও না। বললেন, 'যেমন করেছি—জীবনকে যেমন চালিয়েছি তেমনিই তো হবে—এর চেয়ে ভালো আর কি হ'তে পারে বল।···যে কাঠ খাবে তাকে আংরাই নাদতে হবে। এ সবই ভেবে দেখা উচিত ছিল। এখন আর হায় হায় ক'রে কি হবে?··· বরং ভগবানকে একটা ধন্যবাদ দিই—দয়াই করেছেন তিনি—বামনীকে আগে নিয়ে নিয়েছেন। কিছুই তো পেলে না জীবনে কোনদিন—তবু মরার পর রাজরাণীর মতো যে যেতে পারল—শাঁখা-সিঁদুর নিয়ে, পাড়া ভেঙ্গে লোক এসে সতীসাধ্বী বলে পায়ের ধুলো নিয়ে গেল—এতেই আমি খুশী। আমার দুঃখকষ্ট সওয়া আছে ঢের—আমার সইবেও, কিন্তু তাকে রেখে গেলে বড় বাজত। ঐ হাত শুধু-ক'রে বিধবা হয়ে পরের লাথি ঝাঁটা খেয়ে বেড়াতে হ'ত—কথাটা ভাবলেই আমার বুকের মধ্যে কেমন করে। বেশ গেছে সে, আমার খুব সন্তোষ এতে।'

আসবার সময় গোটা পাঁচেক টাকা দিতে গেলুম—ঠাকুর্দা নিলেন না। বললেন, 'কী করব বল টাকা নিয়ে? দোকানে গিয়ে কিছু কিনে খেয়ে আসব সে ক্ষ্যামতা তো নেই দেহে! উল্‌টে আমার হাতে টাকা দেখলে এরা ভাববে আরও ঢের লুকনো টাকা আছে কোথাও—আমি মানি না। যেটুকু দয়াধম্ম করে সেটুকুও আর করবে না। ও থাক। আমার দিন চলেই যাবে। আর কতদিন রাখবে ভগবান, একদিন না একদিন তো যমের মনে পড়বেই। হ্যা— —।

হাসি আর আসে না—হাসির ভঙ্গী করেন শুধু।

এর অনেকদিন পরে ঠাকুর্দার খবর পেয়েছিলুম আবার। মৃত্যু-সংবাদ।

শেষটা নাকি পক্ষাঘাতের মতো হয়েছিল, ওরা কোনমতে একটা হাসপাতালে ফেলে দিয়ে এসে নিশ্চিন্ত হয়েছিল, কেউ যেতও না,

নিত না। শেষে তারা ভৈরবী বলে কে এক সন্ন্যাসিনী এসে থেকে নিয়ে গিয়ে নিজের কাছে রেখেছিল, সেবাও করেছিল তবে তার পর আর ঠাকুর্দা বেশীদিন বাঁচেন নি, অল্পেই রেহাই াছেন ভৈরবীকে।

রবী নাকি তাঁকে বলেছিল, আমার কাছ থেকেই খবর পেয়ে এসেছিল তাঁকে, তার সঙ্গে নাকি আমার দীর্ঘকালের পরিচয়।

কথা বলার রহস্যটা কি—আমার কোনদিনই আর জানা হয়ে । যদি কোন দিন ওর সঙ্গে দেখা হয়—জিজ্ঞাসা করব।

—শেষ—

এ যাবৎ প্রকাশিত অন্যান্য পকেট বই

আশাপূর্ণা দেবীর
দূরের জানলা

নীহার রঞ্জন গুপ্ত
নিরালা প্রহর

অবধূতের
সাচ্চা দরবার

সুমথনাথ ঘোষের
ফাগুন কখনো যাবে না

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের
মালবী-মালঞ্চ

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের
স্বর্ণচাঁপার দিন

প্রকাশিতব্য পরবর্তী পকেট বইয়ের সম্ভাব্য লেখকবৃন্দ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, জরাসন্ধ
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী
প্রবোধকুমার সান্যাল, প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রফুল্ল রায়, প্রশান্ত চৌধুরী
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বিমল মিত্র, বিমল কর, বাণী রায়
মহাশ্বেতা দেবী, শঙ্কু মহারাজ, সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়
সৈয়দ মুজতবা আলী